ও

অন্যান্য গল্প

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত প্রণীত

প্রকাশক—
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা বুক ষ্টল
[illegible]।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মূল্য ১।০ মাত্র

'মানসী' প্রেস
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

উৎসর্গ

—:০:—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ
পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

* * *

বাণীপূজার প্রথম অর্ঘ্য
"অভ্রপুষ্প"
পিতৃচরণে অর্পণ করিয়া
কৃতার্থ হইলাম।

সেবক

অপূর্ব্ব

ভূমিকা

সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষতঃ পুস্তকাকারে, ইহাই আমার প্রথম উদ্যম। সুতরাং আধুনিক প্রথানুসারে একটী ভূমিকা অত্যাবশ্যক হইলেও সেজন্য কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককে অযথা বিড়ম্বিত না করিয়া নিজেই লিখিতে বসিলাম। সে জন্য বোধ হয় আমার পরিচিত সাহিত্যরথীগণের নিকটে আমি ধন্যবাদের দাবী করিতে পারি।

এমন কিছু প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় কথা আমার স্থূলদৃষ্টির গোচরীভূত হইতেছে না, যাহা এই গ্রন্থের ভূমিকারূপে লিপিবদ্ধ না করিলে আমার বা সাধারণের বিশেষ কোন লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা।

গল্পগুলির মধ্যে কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে মানসী, মালঞ্চ, অর্চ্চনা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত কয়েকটী অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গল্পও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

লিখিবার কালীন বা পুস্তকখানির প্রুফ সংশোধন কালীন এমন কোন হিতৈষী বন্ধুবরেরও সাহায্য পাই নাই যাহার কৃতজ্ঞতার ঋণ সমারোহের সহিত এই ভূমিকায় ব্যক্ত করিতে পারি।

অতএব আর কি লিখিব? ভূমিকাটী আকারে একটু ছোট হইল বটে, কিন্তু কি করিব উপায় নাই। ইতি—

দত্তপুলিয়া, নদীয়া
১লা আশ্বিন, ১৩২৪

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

সূচী

অভ্রপুষ্প

—○*○—

[১]

কি উপায় অবলম্বন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভূত ধনশালী হইয়া দশজনের একজন হইতে পারা যায় তাহারই আন্দোলন চলিতেছিল।

মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের উপরে অবস্থিত একখানি হরিদ্রাবর্ণের দ্বিতলবাটীর বহিঃকক্ষে একটি ক্লাব ছিল। কয়েকটি স্কুল কলেজের ছাত্র মিলিয়া এই ক্লাবটি ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন অনেক মেম্বর ভর্ত্তি হইয়াছেন, একটি লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মাসিক চাঁদা।০ আনা মাত্র।

ঘরের কোণে একটী আলমারিতে বাঁধা অবাঁধা অনেকগুলি পুস্তক ও মাসিক পত্র, আলমারির পার্শ্বেই একখানি তক্তপোষের উপর জাজিম বিছানো, গৃহের মধ্যস্থলে একটী টেবিল ও তাহার চারি ধারে চারিখানি চেয়ার, টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ ইত্যাদি লিখিবার সরঞ্জাম, ইহাই ছিল ক্লাবের অস্থাবর সম্পত্তি।

বাটীর অধিকারী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এ পাশ করিয়া কয়েক বৎসর চাকরি অন্বেষণে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে এই ক্লাবের সেক্রেটারীপদে বৃত হইয়াছেন। পাড়ার অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে রামরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামই

উল্লেখযোগ্য। পাড়ার সম্পর্কে তিনি ঠাকুর্দা হইতেন। বৈকালে অন্য কোথাও বেড়াইতে না গিয়া এইখানে বসিয়াই সভ্যগণের গবেষণা আলোচনায় যোগদান করিয়া বিলক্ষণ আমোদ অনুভব করিতেন। তাঁহার চাঁদা দিতে হইত না, উপরন্তু প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক কাপ করিয়া চা তিনি বিনামূল্যে পাইতেন।

* * * *

সতীশচন্দ্র বসু নামক জনৈক সভ্য বলিলেন যে, বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন বটে, কিন্তু 'তদর্দ্ধে কৃষিকর্ম্মণি'। সুতরাং লক্ষ্মীলাভের বাসনা যদি সভ্যগণের এতই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই উর্ব্বরা বঙ্গদেশের উর্ব্বরতম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষি-প্রধান অঞ্চল সুন্দরবনে দশ-হাজার বা ততোধিক বিঘা জমি লইয়া খুব ধুমধামের সহিত চাষ-বাস করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? সাহেবগণ ইংলণ্ড হইতে সুদূর অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়া এই কার্য্যের দ্বারা প্রভূত ধনশালী হইয়া অল্পকাল মধ্যেই স্বদেশে গিয়া বাড়ী কিনিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কিন্তু নরেন্দ্র নামধারী আর একজন বলিয়া উঠিল যে প্রস্তাবটী অবশ্য খুবই ভাল, কিন্তু সুন্দরবনে চঞ্চলা লক্ষ্মী অপেক্ষা চঞ্চল ব্যাঘ্রের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবারই সম্ভাবনা অধিক। জীবন নিশার স্বপন হইলেও অর্থের জন্য দ্বিপ্রহর রৌদ্রে অর্দ্ধনগ্ন অসভ্য কৃষককুলের সহিত মাঠে মাঠে ঘুরিয়া অবশেষে উক্ত শ্বাপদের আহার্য্যরূপে পরিণত হইতে তাহার ইচ্ছা ত নাই, বরং সম্পূর্ণ অনিচ্ছাই আছে।

আরও কয়েকজন সেই কথার সমর্থন করিল।

উভয়ের বাকবিতণ্ডা থামিলে অপর একজন জানাইলেন যে ধনবান হইবার জন্য যদি তাঁহারা একান্ত অধৈর্য্য হইয়া থাকেন, তবে অবিলম্বে

রাণীগঞ্জে যাইয়া একটী কয়লার খনি খুলুন। সম্প্রতি একজন মাড়োয়ারী সওদাগর তাঁহার খনিটী বিক্রয় করিবেন এ সন্ধানও নাকি তাঁহার জানা আছে।

সেক্রেটারী মহেন্দ্র বাবু সে কথা শুনিয়া গোপের অগ্রভাগ পাকাইতে পাকাইতে বলিলেন—"কলিয়ারি খোলা বড় সোজা টাকার কর্ম্ম নয়। সে কি আমাদের দ্বারা হয়ে উঠবে, বোধ ত হচ্ছে না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতক্ষণ নীরবে বসিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন ও তামাক খাইতেছিলেন। তিনি এতক্ষণে মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"বাবাজীরা ওসব অসম্ভব অসম্ভব পরামর্শ ছেড়ে দিয়ে এক সোজা কাজ কর না কেন। দেখাই যাক্ তোমাদের ব্যবসার নমুনা।"

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল "কি কাজ ভট্‌চায্যি মশাই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"এই শীতের সম্মুখে একটা ভাল জায়গা দেখে একটি চায়ের দোকান খুলে ফেল না কেন—"

বাধা দিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মহেন্দ্র বাবু গোঁপের অগ্রভাগ সূক্ষ্মতম করিয়া বলিলেন—"ওসব ত উঞ্ছবৃত্তি ভট্‌চাযি মশাই, ওসব উঞ্ছবৃত্তি। আমরা যা করতে চাই, তা রীতিমত একটা বিজ্‌নেস্, ওতে আর কি হবে ঠাকুর্দ্দা, ৬৪ বাটি চা বেচলে তবে একটী টাকা হবে, তাতে কি আর চলে কখনও। আপনি সেকেলে মানুষ কি না, তাই কথাটাও বলেছেন একেবারে সেকেলে।"

বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "কত লোক চায়ের দোকান করে কলকাতায় বাড়ী করেছে তার খবর রাখ? মা লক্ষ্মী যখন কৃপা করেন, তখন কোথাদিয়ে যে কি হয়, তা কেউ বুঝতে পারে না।"

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ সেন নামক একটী বি-এ ক্লাসের ছাত্র বলিয়া

উঠিল—"ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে, যা করা যথার্থ সম্ভব তাই একটা কিছু করুন। ওসব রোমান্স ব্যবসায়ে খাটে না। আমি তবে একটা পথ বলে দিই শুনুন সকলে। শুনুন ভট্‌চায মশাই মনোযোগ দিয়ে।"

সকলেই উৎসুক চিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেন্দ্র বলিতে লাগিল, "পরশুদিন তিনটের সময় কলেজ থেকে এসে দেখি দাদার একজন ক্লায়েন্ট এসেছেন, হাইকোর্টে তাঁহার নাকি কি একটা আপীল ছিল। নাম শুনলাম রামসুন্দর বাবু। তিনি বাঙ্গালী. উপাধিটা কি তা এখন ঠিক বলতে পাল্লাম না, তবে এখন বেহারেই বাস কচ্ছেন। দাদা বলেন যে তিনি ব্যবসায়ে একজন কৃতী পুরুষ। অতি অমায়িক ভদ্রলোক, মুখখানিতে যেন একটা মিষ্টতা মাখানো, অতি সদালাপী। সন্ধ্যেবেলা চা খেতে খেতে এ কথা ও কথার পর আমাকে বল্লেন যে বি-এ পাশ করে কি করবেন ভাবছেন? আজকাল যা বাজার চল্লিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি? আরে রামচন্দ্র!"

ভট্টাচার্য্য মশাই একটিপ নস্য লইয়া বলিলেন—"তা ভায়া যথার্থই আজকালকার চাকরীর বাজার তাই দাঁড়িয়েছে বটে। তার পর?"

"তার পর আমি বল্লাম যে কিছুই এখনও ঠিক কত্তে পারি নি, ল'টা ত পড়বো মনে কচ্ছি। তিনি সে কথা শুনে বল্লেন "আচ্ছা পাশ কল্লেন যেন তার পর? হাইকোর্টে ঢুকবেন? মশাই, চোগাচাপকানের খরচ এক বছরের মধ্যে তুলতে পারবেন না। কত এম, এ, বি-এল গড়াগড়ি যাচ্ছে, আপনি ত সুধু বি-এল।"

আমি বল্লাম "যে যদি সার্ব্বিস নিই, এই ধরুন মুনসেফী কিম্বা ডেপুটীগিরি।"

তিনি বল্লেন "খেপেছেন মশাই? প্রথমতঃ তার যোগাড় হওয়াই

মুস্কিল, হলেও ছাপ্পান্ন জেলা ঘুরে বেড়ানর চেয়ে স্বাধীন একটা কাজ করা ভাল নয় কি ? তাই বলি, বিজ্‌নেসে ঢুকুন, যে শীঘ্র উন্নতি করতে পারবেন। সাহেবেরা কি করে, একটু কিছু সুবিধে হলেই দেখবেন ব্যবসায় ধরেছে, লক্ষ্মীশ্রীও তাই ওদের ঘরে।"

সুরেন্দ্রের বক্তব্য শেষ হইলে সভ্যগণ সকলেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "যা বল্লে এতো সেই বাবুটীরই কথা হোল, কি ব্যবসার কথা হোল শুনি।"

সুরেন্দ্র বলিল, "আহা, সে নানান্ রকম মতলব তাঁর মাথায় আছে। তার চেয়ে বরং এক কাজ করবো এখন। কাল রবিবার আছে, খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা তাঁকে একেবারে এখানে নিয়ে আস্‌বো। তোমরা নিজেরাই তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে দেখো। কেমন সেই ভাল নয় কি ?

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "তাই বেশ, সেই চমৎকার হবে 'খন। ভুলো না যেন।

সে যে ভুলিবে না, সেকথার নিশ্চয়তা দিল।

[২]

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সুরেন্দ্রনাথ সেই ভদ্রলোকটীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। দিব্য সুশ্রী ও ফিট্ বাবু। চোখের চশমা হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের পাম্প সু পর্য্যন্ত সমস্তই আধুনিক সভ্যতার পরিচায়ক।

যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "কাল সুরেনের মুখে আপনার প্রশংসা শুনে অবধি আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে ভারি একটা আগ্রহ হয়েছিল।"

মৃদু হাস্যের সহিত তিনি জানাইলেন যে তাঁহাতে দর্শনীয় এমন বিশেষ কিছুই নাই।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে খুবই আছে। সুরেনের মুখে যা শুনলাম, তাতে বুঝেছি যে আপনি ব্যবসায়ে একজন successful man"

তেমনি মৃদু মধুর হাস্যের সহিত তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে কিছুই না, তবে হ্যাঁ, ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাইনের কেরাণী গিরি করার চেয়ে একটা স্বাধীন ব্যবসা করাটা কি মন্দ? নিজের একটা মর্য্যাদাও আছে, তা ছাড়া পয়সাও আছে। আর চাকরিতে হয়তো আপনাকে বদলি কল্লে গিয়ে বর্ম্মায়, এদিকে বাপের ব্যারাম শুনে ছুটী পেলেন না যে একদিন দেখে যাবেন। ঝকমারি মশাই, ঝকমারি।"

সোল্লাসে মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ঠিক বলেছেন, ঝকমারিই বটে।"

তার পর ব্যবসায়ের কথা উঠিল। পরিচয়ে জানা গেল গিরিডি অঞ্চলে রামসুন্দর বাবুর একটী কলিয়ারী আছে, ডুয়ার্সে একটী চা বাগান আছে, ভাগলপুরে বৃহৎ কণ্ট্রাক্টের কারবার আছে, এবং উপস্থিত সাঁওতাল পরগণার কোন একটি বিশিষ্ট অঞ্চলে একটী লাইট রেলওয়ে খুলিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভাগলপুরেই তাঁহার আফিস।

মহেন্দ্র বাবু চমৎকৃত হইলেন। রামসুন্দর বাবু ক্রমে ক্রমে নিজের জীবনের ইতিহাস আরম্ভ করিলেন। কিরূপে কলিকাতায় এক সওদাগরের আফিসে ১৫৲ টাকা বেতনে সর্ব্বপ্রথমে বিল সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং অবশেষে হেড ক্লার্কের সহিত ঝগড়া করিয়া চাকরি ছাড়িয়া রাণীগঞ্জে একটী কয়লার খনিতে রেজিং কণ্ট্রাক্ট লইয়া ক্রমে ক্রমে নিজের বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে এখন মাসিক তিন চার হাজার টাকা আয় করিয়াছেন তাহার ইতিহাস সমস্ত বলিলেন।

সমস্ত শুনিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "ধন্য আপনি।" তার পর দুই

একটী একথা ওকথা বাজে কথার পর অতি বিনীত ভাবে জানাইলেন যে কি করিলে অতি অল্প মূলধনে অতি অল্পদিনের মধ্যে ধনবান হওয়া যায় তাহার বিবরণ এবং উপদেশ তাঁহাকে দিতে হইবে।

মুখখানি গম্ভীর করিয়া, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া রামসুন্দর বাবু বলিলেন "দেখুন, অল্প সময়ে লাভবান হওয়া আজকালকার কালে খুব কঠিন ব্যাপার!" তার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা কোন দিকে আপনাদের টেষ্ট বলুন দেখি?"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "কিছু ঠিক নেই, যাতে দু পয়সা আছে এবং যা ভদ্রলোকের করা সাজে সেই রকম একটা কিছু কর্ত্তে চাই।"

চক্ষু হইতে চশমা জোড়াটা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া হস্তদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিয়া রামসুন্দর বাবু মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়াই বলিলেন, "উত্তম হয়েছে, ঈশ্বর জুটিয়ে দিয়েছেন আপনাদের। একাজে নিশ্চয়ই লাভ হবে জানবেন। আমিও ঠিক আপনাদের মত ব্যবসা কর্ত্তে ইচ্ছুক অথচ শিক্ষিত এবং কষ্ট সহিষ্ণু লোক খুঁজছিলাম। পাঁচটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে নিজে সবগুলো দেখবার সময় পাই না। সুতরাং এ সকল বিষয়ে যদি অন্যকে উৎসাহ দিতে পারি, তবে খুবই ভাল হয়। তবে শুনুন আপনারা, আমার তো বোধ হয় প্রথমেই সেটা আপনাদের বেশ সুট কর্ব্বে।"

"কি রকম?"

তিনি বলিলেন, "একজন লোক পাঠিয়ে দিন তো ঝাঁ করে। বলে দিন যে সে সুরেনের দাদার কাছ থেকে আমার হাত ব্যাগটা নিয়ে আসে।"

একজন লোক তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইল।

রামসুন্দর বাবু বলিলেন "লোহার ডগার নাম শুনেছেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতক্ষণ নীরবে থাকিয়া সব কথা শুনিতেছিলেন, তিনি এইবার বলিলেন "কিসের ডগা বল্লেন ?"

"লোহার।"

অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া তিনি বলিলেন, "লোহার ডগা! লোহার আবার ডগা হয় না কি? এঁ্যা, কালে কালে কতই হোল। হগ সাহেবের বাজারে পাওয়া যায় ?"

মৃদু হাস্য করিয়া রামসুন্দর বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে না, এটা একটা জায়গার নাম। রাঁচির কাছাকাছি।"

"জায়গার নাম লোহার ডগা! এঁ্যা লাউ, কুমড়ো, পুঁইশাকেরই তো ডগা হয়, খায়, তাই তো শুনে আসছি ছেলেবেলা থেকে।"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "ছেড়ে দিন ওসব বাজে কথা ভটচায্ মশাই। হ্যাঁ, তার পর কি বলছিলেন ?"

"সেই লোহার ডগার কিছু দূরে, কতকগুলো গ্রামে পাহাড়ী সাঁও-তালদের মধ্যে টাকায় চার সের করে ভাল ঘী পাওয়া যায়।"

সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তিনি বলিলেন "এঁ্যা, ঘী! টাকায় চার সের করে? না না! রেড়ির তেল বলুন।"

স্বভাব সুলভ সেইরূপ মৃদু হাস্যের সহিত রামসুন্দর বাবু বলি-লেন "আজ্ঞে হ্যাঁ ঘী। বেশ ভাল ঘী টাকায় চার সের ?"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এঁ্যা বলেন কি ? ভাল ঘী টাকায় চার সের! আপনি দেখেছেন না শুনেছেন ?'

"আমি নিজে সেখানে গিয়েছিলাম। পাহাড়ীদের সঙ্গে ও বিষয়ে কথা কয়েছি। নমুনা এনেছি। ব্যবসা কি আর অমনি ঘরে বসে

স্বপ্ন দেখলে হয় ? খাটতে হয়, ২।১ বার আসা যাওয়া কর্ত্তে হয়, টাকা খরচ কর্ত্তে হয়।”

২।১ জন সভ্য বলিলেন “বলেন কি মশাই, টাকায় চার সের করে ঘী, এতো স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে। চর্ব্বি ফর্ব্বি মিশানো নয় তো? ময়াল সাপ তো ও সব অঞ্চলে খুবই পাওয়া যায় শুনেছি।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভ্রুযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “কিছুই অসম্ভব নয় দাদা! লোহার যেখানে ডগা হয় সেখানে যে টাকায় চার সের করে ঘী বিকুবে এতে সন্দেহ এব নাস্তি।”

মহেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “বেশ ভাল ঘী?”

প্রেরিত ভৃত্যটি এমন সময়ে রামসুন্দর বাবুর ব্যাগ লইয়া আসিল। রামসুন্দর বাবু বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে নমুনা দেখুন না। সেই জন্যেই আমি ব্যাগ আনতে পাঠিয়েছিলাম।”—বলিয়া ব্যাগ খুলিয়া একটী মুখচওড়া শিশি বাহির করিলেন। ঢাকুনি খুলিয়া সকলেই একে একে আঘ্রাণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তর্জ্জনী দ্বারা একটু লইয়া বামহস্তের কব্জিতে একটু ঘসিয়া ঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, “বাঃ বাঃ খাসা ঘী তো, এই ঘী চার সের করে?”

রামসুন্দর বাবু বলিলেন “আজ্ঞে হ্যাঁ। গাওয়া ঘীও পাওয়া যায় টাকায় দুই সের, গরুর চেয়ে মোষই ওদিকের লোকে বেশী পোষে কি না।”

“গাওয়া ঘী টাকায় দু’সের, অবাক কল্লেন যে।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও যখন প্রথম শুনেছিলাম, তখন আপনাদের চাইতেও অবাক হয়েছিলাম। এমন কি গাঁজাখুরি বলে তো কথাটা একবারে উড়িয়েই দিয়েছিলাম।”

নরেন এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল "লোহারডগাটা কোথায় বল্লেন।"

"ছোটনাগপুরে। রাঁচি আর পালামৌ এই দুইজায়গায় প্রায় মাঝামাঝি। এখান থেকে রাঁচি গিয়ে ট্রেণ ধরবেন, তাহলেই লোহারডগায় পৌছান যাবে, তার পরে সেখান থেকে প্রায় মাইল চল্লিশেক গরুর গাড়ী করে—"

সভ্যবৃন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। নরেন বলিল "কি সর্ব্বনাশ, চল্লিশ মাইল গরুর গাড়ী করে যেতে হবে?"

রামসুন্দর বাবু বলিলেন,"আহাঃ সে কি আর আপনাদের বেলগেছের গরুর গাড়ী? দিব্য আরামে যাবেন, সে টমটমের বাবা, তাকে ওদেশে স্যামপিনি বলে। যাক্ এখন আসল :কথা হচ্ছে যে একাজ কত্তে আপনারা প্রস্তুত কি না।"

মহেন্দ্রবাবু যে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কৃতনিশ্চয়, সে কথা বারম্বার তাঁহাকে জানাইলেন, এবং সভ্যগণের মধ্যে কে কে এ কার্য্যে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহা সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হইল।

ঘৃতের মূল্যের সুলভতা শুনিয়া যাহারা উৎসাহিত হইয়াছিল, পথের বিবরণ শুনিয়া তাহারা অনেকেই পিছাইল। কেবল নরেন্দ্র খুব উৎসাহের সহিত বলিল "কুছ পরোয়া নেই, আমি করবো।"

সুরেন্দ্রনাথকে মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "সুরেন তুমি?"

মুখখানি বিকৃত করিয়া সুরেন্দ্র বলিল "ইচ্ছেত খুবই ছিল, কিন্তু একজামিনটা সামনে—"

"ভট্টাচার্য্য মশাই?"

তিনি একটিপ নস্য লইয়া বলিলেন "আমাকে আর এ বুড়োবয়সে

লোহারডগায় জড়িওনা ভাই। তোমরা বেঁচে বর্ত্তে থাক, উন্নতি কর, আমি দেখি আর আশীর্ব্বাদ করি।"

অবশেষে স্থির হইল যে মহেন্দ্রবাবু টাকা দিবেন, নরেন্দ্র রামসুন্দর বাবুর সহিত কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া ঘৃত চালানের বন্দোবস্ত করিবে। ঘৃতের মূল্যের উপর রামসুন্দর বাবু যৎসামান্য কমিশন লইবেন মাত্র। আরও স্থির হইল যে পরদিনই এটর্ণির বাড়ী গিয়া এইপ্রকার বন্দোবস্তের লেখাপড়া হইবে। যাত্রার দিন শুক্রবার স্থির হইল।

রামসুন্দর বাবু তখন গাত্রোত্থান করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন "তা মশাই, ঘীয়ের ব্যবসা তো যখন খুলবেন তখন হবে, আপাততঃ সের খানেক ঘী যদি আমাকে দেন তা হলে চার আনার জায়গায় আমি পাঁচ আনাও দিতে পারি।"

সহাস্যে রামসুন্দর বাবু বলিলেন "কোথায় পাব বলুন, আমি অল্প একটু নমুনা এনেছিলাম বৈ ত নয়। তা এঁরা যখন কাজটা হাতে কচ্ছেন তখন আপনার ঘীয়ের ভাবনা নেই।"

এই বলিয়া নমস্কার করিয়া রামসুন্দর বাবু চলিয়া গেলেন।

[৩]

রামসুন্দর বাবু চলিয়া গেলে মহেন্দ্র বাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলেন "কি রকম বুঝেছো ঠাকুর্দ্দা। লক্ষণটা কি শুভ বলে মনে হচ্ছে, না অশুভ ?"

হস্তদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিয়া, হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া, তিনি বলিলেন—"কিছু ত বুঝতে পাচ্ছি না দাদা, আমি তো ভারি ধাঁধায় পড়েছি। ।৹ আনা করে অমন সুন্দর ঘী একসের পাওয়া যায় তাতো

কখনও শুনি নি। যদি কাজটা ভালয় ভালয় বেধে যায় তাহলে খুব শুভ বৈ কি। খরচখরচা বাদ সেরকরা ৸০ আনা লাভ কি সোজা কথা?"

এই কথা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেশ করিয়া আর এক টিপ নস্য লইয়া বলিলেন, "মোদ্দাৎ সে যাই হোক দাদা, আমি কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে ঘী নিয়ে সেরকরা পাঁচ আনার বেশী দিচ্ছিনে, তা আগে থেকেই বলে রাখছি।"

ঈষৎ হাসিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল ভট্‌চায মশাই। আচ্ছা আপনার আশীর্ব্বাদে কাজটা বেধে গেলে ফি মাসে একসের করে ঘী আমি আপনাকে খেতে দেব।"

মস্তক আন্দোলন করিয়া সোল্লাসে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "নিশ্চয়ই বাধবে, বেধে রয়েছে। এই আমি পৈতে হাতে করে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি।" বলিয়া তিনি পিরাণের বোতাম খুলিয়া স্বীয় উপবীত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সভ্যগণ একে একে প্রস্থান করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও গা তুলিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, মহেন্দ্র বাবু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "সে কি হয় ঠাকুদ্দা, তোমার সঙ্গে আজ ঢের পরামর্শ আছে। আমাদের দলের মধ্যে তুমিই হচ্চো প্রবীন লোক।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিলেন। নরেনকেও অপেক্ষা করিতে বলা হইল।

তখন তিনজনে মিলিয়া অনেক হিসাব অঙ্কপাত প্রভৃতি করিয়া ঘৃতের খরিদ মূল্য, রেলভাড়া, গাড়ীভাড়া, কমিশন প্রভৃতি খরচ খরচা সমস্ত ধরিয়া আনুমানিক কি পরিমাণ লাভ হইবে তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "ঘর একখানা বেশ ভাল জায়গা দেখে নিতে হবে।"

সে কার্য্যের ভার নরেন্দ্রের উপর অর্পণ করা হইল।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "আর একখানা ভাল সাইনবোর্ড।"

নরেন্দ্র বলিল "আর রাংতার অক্ষরে লেখা বেশ ভাল বাঁধান একখানা 'ধারে বিক্রয় নাই'।"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "হ্যাঁ তা চাই বৈ কি, একখানা টেবিল, দুটো চেয়ার, একটা গণেশঠাকুর, গোটাকতক ঘী রাখবার জালা, কেনেস্ত্রা, দাড়ি পাল্লা, এসবগুলোর যোগাড় ইতিমধ্যে করে রাখতে হবে।" বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা, কি ট্রেড মার্কা করা যায় বল দেখি? এমন একটা কত্তে হবে, যা লোকে ঝাঁ করে নকল কত্তে পারবে না।"

মুহূর্ত্তকাল চিন্তার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "ট্রেড মার্কা কর গিয়ে 'গরু'। গরু থেকেইত ঘীয়ের উৎপত্তি, বেশ লেখা থাকবে 'গাভী মার্কা বিশুদ্ধ ঘৃত'।"

হো হো করিয়া হাসিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "তা নয় ঠাকুর্দ্দা, তা নয়। ওসব গরু ফরু সেকেলে জিনিসে চলবে না! আর ওতো যে সে নকল কত্তে পারবে। তার চেয়ে আমারই ফটোগ্রাফ তুলিয়ে তারই একখানা ব্লক করে ছাপিয়ে টিনে টিনে এঁটে দেবো। কারও বাবারও সাধ্যি নাই যে নকল করেন। কল্লেই একেবারে শ্রীঘর।"

উভয়েই মহেন্দ্র বাবুর বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। তার পর ঘৃতের ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া অবশেষে সকলে নিজ নিজ গৃহে গেলেন। তিন জনের মধ্যে কাহারও সে রাত্রে ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না।

[৪]

নির্দ্ধারিত সময়ে এটর্ণির আফিসে যাইয়া চুক্তিপত্র লেখা পড়া হইয়া গেল। স্থির হইল যে মহেন্দ্র বাবুর মূলধন ও নরেন্দ্রের পরিশ্রম, এই বাবদে মহেন্দ্র বাবু বার আনা ও নরেন্দ্র চারি আনা অংশ পাইবে। রামসুন্দর বাবু যাহা কমিশন লইবেন তাহা উভয়েরই অংশ হইতে দিতে হইবে।

শুক্রবারে রাঁচি এক্সপ্রেসে রামসুন্দর বাবু ও নরেন্দ্র উভয়ে লোহার-ডগা যাত্রা করিবেন তাহাও স্থির হইল। পাহাড়ীদের নিকট কিছু অগ্রিম দাদন দিলে দশহাজার বিশ হাজার মণ ঘৃতও দুষ্প্রাপ্য নহে এমত আশ্বাসও পাওয়া গেল।

ক্লাবে আসিয়া পঞ্জিকা দেখা হইল। স্বয়ং ভট্টাচার্য্য মহাশয় পঞ্জিকা দেখিয়া বলিলেন যে উক্ত দিন গাত্রহরিদ্রা, বিবাহপত্র, আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন, ঔষধ সেবন, হলপ্রবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পক্ষে অতি প্রশস্ত। প্রাতে দশ ঘটিকার মধ্যে মাহেন্দ্রযোগও আছে দেখা গেল।

রামসুন্দর বাবু বলিলেন "ঈশ্বর সহায় আপনাদের। কিরকম শুভদিন দেখলেন তো? তার পর আবার মাহেন্দ্রযোগ। আমরাও ঠিক রাত্রি সাড়ে নটার রাঁচি এক্সপ্রেসেই রওনা হব। তখন ভরা মাহেন্দ্রযোগ।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানাইলেন, যে উক্ত শুভযোগ রাত্রি দশঘটিকা পর্য্যন্ত নহে, প্রাতে দশঘটিকা পর্য্যন্ত। রামসুন্দর বাবু আধুনিক মুদ্রা-যন্ত্রের বহু নিন্দা করিয়া বলিলেন যে কম্পোজিটারগণ ওরূপ ভুল প্রায়ই করিয়া থাকে। একবার একখানি পাঁজিতে নাকি ৫ই আশ্বিনের পরি-বর্ত্তে ৫ই জ্যৈষ্ঠ দুর্গোৎসব হইবে এইরূপ লেখা ছিল। তাহা রামসুন্দর বাবু স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

বন্দোবস্ত সমস্তই ঠিক হইল বটে কিন্তু টাকার যোগাড় করিতে মহেন্দ্র বাবুকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী প্রথমে কথাটা শুনিয়া হাসিয়াই উঠিলেন এবং পুত্রের বুদ্ধিবৃত্তির সহিত উন্মাদের তুলনা করিয়া দিনকতক পশ্চিমে বায়ু সেবন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া বলিলেন,"কোন জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে কেন খামকা টাকাগুলো নষ্ট করবি, তার চেয়ে বরং ওই হাজার টাকা জামিন দিয়ে কোন একটা ভাল চাকরিতে ঢোক।"

মহেন্দ্র বাবু যখন দেখিলেন যে মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে টাকা সহজে হস্তগত হইবার আশা অতি অল্প, তখন তিনি জানাইলেন যে তাঁহার প্রথম উদ্যমে যদি এরূপে বাধা দেওয়া হয় তাহা হইলে হয় তিনি এসিড সেবন করিয়া নিজের অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, নয়ত যুদ্ধে যাইবেন।

অগত্যা মাতাঠাকুরাণী টাকা দিতে স্বীকৃতা হইলেন বটে, কিন্তু বিঘ্নর উপর বিঘ্ন। আবার বৃহস্পতিবারের আপত্তি উঠিল। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সেইদিনই টাকা বাহির করিয়া লইলেন।

শুক্রবার যথাসময়ে একহাজার টাকা লইয়া নরেন্দ্রনাথ রামসুন্দর বাবুর সহিত ঘৃতের ব্যবসায় করিতে রওনা হইল। মহেন্দ্র বাবু ও ক্লাবের অনেক সভ্য হাবড়ায় সমবেত হইয়া মহাসমারোহ সহকারে তাঁহাদের ট্রেণে তুলিয়া দিল। নরেন্দ্রের গলায় প্রত্যেকে একটী করিয়া ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন।

গাড়ীর লোকেরা নরেন্দ্রকে নিঃসন্দেহে বর বলিয়া অনুমান করিয়া লইল, কিন্তু বরের পরিধানে চেলির কাপড় নাই দেখিয়া তাহারা যে একটু বিস্ময়াপন্ন না হইয়াছিল এমন নহে।

[৫]

পরদিন অপরাহ্ণে মহেন্দ্রবাবুর নামীয় এক টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া জানা গেল যে নরেন্দ্র ও রামসুন্দর বাবু সেইদিন সাড়ে দশটার সময় নিরাপদে রাঁচি পৌঁছিয়াছেন এবং সেদিন সেখানে তাঁহারা বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রত্যূষে লোহারডগা যাত্রা করিবেন।

ষষ্ঠ দিনে আর একখানি পত্রে জানা গেল যে লোহারডগায় তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছে। সেখানকার ডাকবাঙ্গলায় একরাত্রি থাকিয়া তাহারা আরও দূরে অগ্রসর হইবে। গন্তব্যস্থানের নাম পত্রে লেখা ছিল না।

মহেন্দ্রবাবু ইতিমধ্যে এদিকের যোগাড় সমস্ত করিয়া ফেলিলেন। মাসিক ৩৫৲ টাকা ভাড়ায় হ্যারিসন রোডের উপর একখানি ঘর লওয়া হইল, সাইনবোর্ড, গণেশ, 'ধারে বিক্রয় নাই,' প্রভৃতি সরঞ্জাম একে একে সাজান হইল। লাইসেন্সের জন্য পুলিশ ও মিউনিসিপালটীতে দরখাস্ত করা হইল।

কিন্তু নরেন্দ্রের পত্র পাওয়ার পর ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত তাহার আর কোন পত্র বা অন্য কোন খবর পাওয়া গেল না। সে ঘৃতের চেষ্টায় নানা স্থান ঘুরিতেছে, এবং সে সব অঞ্চলে পোষ্টাফিস তত বেশী নাই, এই সকল কারণেই হয় তো সে পত্র দিতে পারিতেছে না, ইহা মনে করিয়া আরও কয়েকদিন এবং ক্রমে এক মাস কাটিল। তখন সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহেন্দ্র বাবুকে বলিলেন "দাদা আর দেরী করো না, ছোকরার খোঁজটা একবার যেমন করে পার নাও।"

মহেন্দ্র বাবুও চিন্তার সহিত বলিলেন "ঠিকানা কোথায় পাব

ঠাকুদ্দা, এক লোহারডগা ছাড়া তো আর কিছুই জানিনে। আমারও তো কদিন ধরে ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না।"

তখন পরামর্শ করিয়া সকলে সুরেন্দ্রের দাদার নিকট রামসুন্দর বাবুর ঠিকানা জানিতে গেলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে তাঁহার ঠিকানা সম্বন্ধে তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী কিছুই জানেন না। মাঝে মাঝে মামলা মকর্দ্দমা হইলে তাঁহার কাছে আসেন এই পর্য্যন্ত।

সকলে নরেন্দ্রের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। রামসুন্দর বাবু একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন যে ভাগলপুরে তাঁহার হেড আফিস, সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া কেবল তাঁহার নামের নীচে ভাগলপুর এই বলিয়া এক প্রিপেড টেলিগ্রাম করা হইল।

সন্ধ্যার সময় টেলিগ্রাম ফেরত আসিল, তাহার পশ্চাতে ডাকঘরের একখণ্ড স্লিপ সংযুক্ত ছিল, তাহাতে লেখা ছিল যে উক্ত নামধারী কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পুলিসে খবর দেওয়া হইবে কি না সে বিষয়ে সভ্যগণের ভোট লওয়া হইল। কিন্তু ২১ জন সভ্যের মধ্যে ৭ জন মাত্র সে প্রস্তাব সমর্থন করিয়া হাত তুলিলেন। সুতরাং কিছুই স্থির হইল না। সেদিনও কাটিল।

[৬]

পরদিন প্রাতঃকালে আবার সভ্যগণের ভোট লওয়া হইতেছিল, এমন সময় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মশাই, এইটাই কি মির্জ্জাপুর ফ্রেণ্ডলি ক্লাব ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিয়া একজন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নিজের চেয়ারখানি আগন্তুককে দিয়া বলিল "বসুন।"

তিনি বসিলে মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?"

তিনি তদুত্তরে কিছু না বলিয়া প্রশ্ন করিলেন "মহেন্দ্রনাথ মিত্র কার নাম ?"

"আজ্ঞে আমারই নাম। কোথা থেকে আসছেন আপনি ?"

লোকটি বলিলেন, "আমি হচ্ছি মশাই রাঁচির এসিষ্টাণ্ট জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। ছুটি নিয়ে কাল কলকাতায় এসেছি।"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "তা এখানে আসা হয়েছে—"

বাধা দিয়া আগন্তুক বলিলেন "নরেন্দ্রনাথ সেন বলে কাকেও চেনেন ?"

অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন "খুব চিনি। কোথায় সে ?"

"তিনিই আমাকে এখানে আসতে বলেছেন। তিনি এখন রাঁচিতেই আছেন।"

"কোথায় ?"

গম্ভীরভাবে আগন্তুক বলিলেন "জেলে।"

"জেলে ?" প্রায় সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। "বলেন কি মশাই জেলে ?"

তিনি বলিলেন "সে এক ভয়ানক ব্যাপার মশাই। চুরির কেস। ওই নরেন বাবুটী ও আর একটী কে বাবু দুজনে ওই অঞ্চলে খুব ঘুরে বেড়াতেন। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলতেন যে আমরা ঘী কিনতে এসেছি। তার পর মশাই, একদিন রাঁচিতে বিখ্যাত কাপড়ের মহাজন লছমন দাস ক্ষেত্রীর দোকানে আশ্চর্য্যজনক এক চুরি হয়ে গেল। প্রায় ছ'হাজার টাকা নগদ আর প্রায় তিন চার হাজার টাকার শাল,আলোয়ান, মলিদা, এই সব জিনিস একেবারে গাফ। পুলিস সন্ধান করে দেখলে

যে ঠিক তার আগের রাত্রে ওই বাবু দুটী সে বাসা ছেড়ে কোথায় গিয়েছেন তা কেউ জানে না। তখন ত পুলিসের এক মহাসন্দেহ হ'ল। একেবারে খোঁজ খোঁজ করে শেষে মশাই, খুকরায় গিয়ে পুলিস তাদের সন্ধান কল্লে, নরেন বাবুটীকেই পাওয়া গেল, তাঁর সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁকে আর পাওয়া গেল না। বোধ হয় বেগতিক দেখে তিনি আগেই চম্পট দিয়েছিলেন। নরেন বাবুত শুনতে পাই পুলিসের কাছে বলেছেন যে তিনি কিছুই জানেন না। কলকাতা থেকে সেই বাবুটীর সঙ্গে ঘী কিনতে এসেছিলেন, তার পরে সেই বাবুটী নাকি বলেন যে কেবল ঘী নয়, শাল, আলোয়ানেরও কারবার করা যাবে। এই বলে তিনি তিন চারবার অনেক পশমী কাপড় নিয়ে আসেন। তাঁর কাছথেকে কত টাকা আর সেইসব কাপড় থেকে কতকগুলি নিয়ে তিনি নাকি জব্বলপুরে না কোথায় গিয়েছেন।"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "তার পর?"

"তারপর আর কি? পুলিসে ত সে কথায় ভোলে না, ধরে নিয়ে এসে রাঁচিতে আদালতে হাজির কল্লে। সেখানেও তো তিনি অনেক কাঁদাকাটা কল্লেন, নূতন লোক দেখে কেউ জামিনও হতে চাইলে না। তার পর যা হবার তাই হোল। ছোকরাকে জেলে নিয়ে গেল। ভদ্রলোকের ছেলে দেখে আমারও কেমন একটা মায়া হ'ল। আমি ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসছি দেখে তিনি অনেক কাকুতি মিনতি করে আমাকে এসে বল্লেন যে আমি যেন আপনাদের এখানে এসে এই সব কথা জানাই।"

সকলে স্তম্ভিত হইলেন। মহেন্দ্র বাবুর চোক দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটীকে চা ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিয়া জলযোগ করানর পর তিনি বিদায় হইলেন।

[৭]

সেই রাত্রেই রাঁচি এক্সপ্রেসে মহেন্দ্রবাবু এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও আরও দুই একজন রাঁচি যাত্রা করিলেন।

অনেক কৌশল ও অর্থব্যয় করিয়া নরেন্দ্রকে মুক্ত করা হইল। সে জেল হইতে বাহিরে আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

অপরাহ্ণে সকলে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

যে ঘরখানি দোকানের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছিল সেখানি অবিলম্বে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সাইনবোর্ডখানি ভাঙ্গা লোহার দরে মেছুয়া-বাজারে বিক্রয় করা হইল। 'ধারে বিক্রয় নাই' ও গণেশঠাকুরটী জনৈক পরিচিত দোকানদারকে উপহার দেওয়া হইল।

রামসুন্দর বাবুর আর কোনও খবর পাওয়া গেল না।

অনেক চেষ্টা করিয়া উভয়েই চাকরিতে ঢুকিলেন। ব্যবসায়ের খেয়াল তাঁহাদের মস্তিষ্ক হইতে তখন সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হইয়াছিল।

হোটেলওয়ালা

[১]

হাবড়ার পুলের অনতিদূরে, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিত একখানি খোলার দ্বিতল বাটীর সম্মুখস্থ একখানি মুদীর দোকানে আসিয়া এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ মুদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে বাপু, এখানে একটা হোটেল ছিল না ?"

জ্যৈষ্ঠমাস, দ্বিপ্রহর, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। মুদী ভিজা গামছা গায়ে জড়াইয়া হিসাবের খাতা দেখিতেছিল। ব্রাহ্মণকে হাত তুলিয়া প্রণাম করিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ ঠাকুর, ঐ যে উপরেই 'হিন্দু হোটেল' বলে লেখা রয়েছে। যান ঐ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে। ওই যে দড়াটা ঝুলছে, ওইটে ধরে উঠবেন, নইলে আবার বুড়ো মানুষ পাছে পা হড়কে—"

মুদীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে দড়া ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে উঠিতে লাগিলেন। পাশেই একখানা সাইনবোর্ড ঝুলিতেছিল, তাহাতে লেখা ছিল, "হিন্দু হোটেল, ভদ্রলোকগণের আহারের স্থান, শ্রীবাঞ্ছারাম মুখোপাধ্যায়।"

একখানি তক্তপোষে জনৈক স্থূলোদর ব্যক্তি বসিয়া ছিল, ব্রাহ্মণ উপরে উঠিবামাত্র সে নিজ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পৈতাটি বাহির করিয়া স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বলিল, "আসতে আজ্ঞা হয় ঠাকুর মশাই"—বলিয়াই নমস্কার করিল। ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদন করিলেন।

ব্রাহ্মণের পরিধানে একখানি থান-ধুতি, গায়ে একখানা পাতলা উড়ানি জড়ানো ; তাহাও স্থানে স্থানে ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া গিয়াছে। হাতে

হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তাহার হাতল দুটিতে একখানি গামছা দ্বারা আবদ্ধ নাতিক্ষুদ্র একটি হুঁকা। অপর হস্তে ছাতা ও একগাছি লাঠি। মাথায় সুপুষ্ট শিখা গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় দুলিতেছিল।

তক্তপোষের একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "উঃ বাপরে কি গরমটাই পড়েছে এবার!"

সঙ্গে সঙ্গে বাঞ্ছারাম বলিল, "উঃ, কথায় কাজ কি?"—বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরের আসা হ'চ্ছে কতদূর থেকে?"

"আজ্ঞে মগরা থেকে।"

"পোস্তায় আঁব কিনতে বুঝি?"

একটু মুচকি হাসি হাসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আজ্ঞে না, আঁব কিনতে আসি নি, এসেছি অন্য একটু কাজে। তা, আজকে এখানে আমায় থাক্‌তে হবে, সে বন্দোবস্ত হতে পারবে ত?"

গর্ব্বস্ফীত মুখে বাঞ্ছারাম বলিতে লাগিল, "স্বচ্ছন্দে! আমার এখানে থাকার সুবিধে হবে না ত কোথায় হবে—ওর নাম কি উইলসেনের হোটেলে? মশাই, আপনার বাপ মার আশীর্ব্বাদে এই কলকাতা সহরে আমার চারখানা হোটেল চল্‌ছে। সুখ্যাতিও মা কালীর প্রসাদে সবাই করে থাকে।" বলিয়া সে কালীমাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল, "একটু ঠাণ্ডা হয়ে, তামাক টামাক খেয়ে, তা 'হলে স্নান টান করে আসুন।"

বাঞ্ছারামের আহ্বানে এক খঞ্জ বৃদ্ধা ঝি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একটি গলাভাঙ্গা ক্ষুদ্র শিশিতে করিয়া অর্দ্ধ শিশি পরিমাণ সর্ষপ তৈল লইয়া আসিল। ভাঙ্গা শিশি দেখিয়া বাঞ্ছারাম চীৎকার করিয়া ঝিকে বলিল, "ও ভাঙ্গা শিশিটে আন্‌লি কেন? গণ্ডা গণ্ডা ভাল ভাল সব শিশি রয়েছে, তাই একটা আন্‌লেই ত হোত। কেমন যে তোদের স্বভাব!"

ঝিও গরম মেজাজে বলিল, "কোথায় আবার গণ্ডা গণ্ডা শিশি, সাতজন্ম কাল ধরে ত এই একটাই শিশি দেখে আসছি—"

ব্রাহ্মণ বাধা দিয়া বলিল, "থাক্‌গে থাক্‌গে, শিশি তো আর মাখ্‌বো না, মাখ্‌বো তো তেল, তা শিশি ভাঙ্গা হলে কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল।"

উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিয়া, ব্যাগ হইতে হুঁকা ও তামাকের সরঞ্জাম বাহির করিয়া 'ধূমযাত্রা' সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। যাইবার সময় ব্যাগটির তত্ত্বাবধান করিবার উপদেশ কর্ত্তাকে দিতে ভুলিলেন না।

[২]

বাঞ্ছারাম মুখোপাধ্যায়ের পিতা নবীনচন্দ্র রজক কোন একটি অবৈধ কারণে গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দ্বাদশবর্ষবয়স্ক পুত্র বাঞ্ছারাম ও তাহার কনিষ্ঠকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া একটি বড় ধোপার অধীনে চাকরি করিত। সে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

অবশেষে বাঞ্ছারামের বিবাহ দিবার দুই বৎসর পরেই যখন নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হইল, তখন সহসা বাঞ্ছারাম সংসার অন্ধকার দেখিল। কিন্তু বুদ্ধিমান যুবক অধিক বিচলিত না হইয়া এক পয়সা ব্যয়ে একগাছি পৈতা কিনিয়া পরদিনই মুখোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়া জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের বাড়ী পাচকরূপে প্রবেশ করিল।

কিন্তু বিধি তাহাতেও বাম হইলেন। প্রায় এক মাস পরে তাহার মনিব কোন উপায়ে তাহার বংশ বিবরণ অবগত হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ যথেষ্ট ভর্ৎসনার সহিত বিদায় দিলেন। উৎসাহশীল বাঞ্ছারাম স্ত্রীর

গহনা বন্ধক দিয়া অল্পদিন মধ্যেই এক হিন্দু হোটেল খুলিয়া বসিল। সেই বৎসরই তাহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।

লক্ষ্মীদেবী অধ্যবসায়ী ব্যক্তিগণকেই কৃপা করিয়া থাকেন, সুতরাং বাঙ্গারামের উপরেও অচিরেই চঞ্চলার কৃপা হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এক, দুই করিয়া চারিটি হোটেল বা হিন্দু ভোজনাগার কলিকাতা নগরীতে 'বাঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়' নামাঙ্কিত সাইনবোর্ড সহ স্থাপিত হইয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের হিন্দুয়ানি অক্ষুণ্ণ রাখিতে লাগিল। শীর্ণকায় বাঙ্গারাম কালপ্রভাবে স্থূলকায় হইল। ভাইটি হোটেলগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইত, যখন হঠাৎ রাঁধুনি ব্রাহ্মণের অভাব হইত, তখন সেই তাহার স্থলে 'একটিনি' করিত। এইরূপে বেশ কাটিতেছিল।

ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া আসিলে বাঙ্গারাম উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ঠাকুর! ঠাকুর মশায়ের জায়গা কর, সঙ্গে সঙ্গে আমার জায়গাটাও কর।"

অল্পসময় মধ্যেই খঞ্জ ঝি আসিয়া জানাইল যে আহার্য্য প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া বাঙ্গারাম পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যাইয়া আহারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর মহাশয়ের নাম ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। মশায়ের ?"

গালভরা অন্নব্যঞ্জন সহ বাঙ্গারাম বলিল, "ছিরি বাঙ্গারাম মুকোপাদ্যোয়।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তা, কি অভিপ্রায়ে কলকেতায় আসা হয়েছে ঠাকুরের ?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "দায়ে পড়েই আস্‌তে হয়েছে।"

কৌতূহলের সহিত বাঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ?"

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, "দেখুন মশাই, সে আজ প্রায় এই হিসেব

করে দেখুন, সাত বছরের কথা হল আমার গৃহিণী পরলোক গমন করেছেন। সাত বছর—হ্যাঁ সাত বছরই ত, এই শ্রাবণে সাত বছর পূর্ণ হবে।"

ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার চক্ষুদুটি যেন ছলছল করিতে লাগিল।

বাঞ্ছারাম বলিল, "তার পর কি হল?"

"তার পর? ছেলে পিলের মধ্যে একটি ছেলে ছিল, তা সেটিকেও আজ তিন বছর হল হারিয়েছি। একটি মেয়ে মাত্র এখন আছে। সংসারে আর কেউ না থাকলেও, যথার্থ বলছি মুকুয্যে মশাই, অভাব কাকে বলে কখনও টের পাইনি। জমী দু দশ বিঘা ছিল, একজনের সঙ্গে ভাগে চাষ হোত। তাছাড়া আমাদের গাঁয়ের জমিদার মল্লিক বাবুদের যুগল-কিশোর ঠাকুর ছিলেন, তাঁর পূজা করতাম, তার দরুণও মাসে মাসে কিছু কিছু পেতাম। এক রকম করে বেশ কেটে যেত। তার পরে স্ত্রী বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই আমার লক্ষ্মীও অন্তর্দ্ধান হলেন। মল্লিক-বাবুদেরও অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে গেল, জমীজমাও সব ছন্নছাড়া হয়ে গেল। তবুও তেমন কষ্ট পাইনি। এখন মেয়েটি নিয়েই হয়েছে যত ভাবনা, ঈশ্বরেচ্ছায় দশ বছরেরটি হয়ে উঠেছে, আর বিয়ে না দিলে ভাল দেখায় না। আজকালকার ধেড়ে ধেড়ে পনেরো ষোল বছরের মেয়ের বিয়ের যে প্রথা হয়েছে, সে ত আমি পারব না। শাস্ত্র মেনে চলতে হলে বিয়েটি এই বেলাই দিতে হয়। গরীবের ঘরের মেয়ে, জানেনই ত আজকালকার কারখানা, ফেল কড়ি, মাখ তেল।"

বাঞ্ছারাম উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "তাই হয়েছে বটে, আজকাল। তার পর বিয়ের কিছু স্থির হল?"

"কই আর হল। পাঁচ জায়গায় গাড়ী ভাড়া, রেল ভাড়া করে যাচ্ছি, আসছি, কেবল কতকগুলো পয়সাবৃষ্টি হচ্ছে বৈ ত নয়। যেখানেই যাচ্ছি, সেই খানেই টাকার হাঁক শুনে পেছিয়ে আসতে হয়।"

"কলকেতাতে কোথায় স্থির হল?"

"স্থির কিছু হয়নি। বউবাজার নেড়াগির্জ্জের ওখানে একটী ছেলে থাকেন, হুগলীর ওইদিকে তাঁদের বাড়ী। পাঁচটী ভাই, ছেলেটি এখানে একটী চাকরি করেন। কিছু কম হবে এই রকম আশ্বাস পেয়েই ত আজ এসেছি ছেলেটীকে দেখতে, এখন দেখা যাক্, কতদূর কি হয়। ভগবানের ইচ্ছা সব, তাঁর হাত ছাড়া ত আর পথ নেই!"

"একশো বার"।—জল খাইয়া বাঞ্ছারাম আবার বলিল, "হ্যাঁ, মেয়ের বিয়েটা আজকাল ঐ রকমই হয়ে পড়েছে বটে। কায়স্থদের দেখাদেখি বামুনের ঘরেও,—ওর নাম কি আমাদের ঘরেও—ঐ প্রথাটা ঢুকেছে।"

আহার সমাপন হইবার পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "তা হলে একবার ঘুরে আসি মুখুয্যে মশাই। ব্যাগটা আর হুঁকোটা রইলো আপনার জিম্মায়।"

"রোদ্দুরটা আর একটু পড়লে হোত না?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্যামাচরণ নীচে নামিয়া গেলেন।

[৩]

শ্রান্তদেহে, শুষ্কমুখে ব্রাহ্মণ যখন ফিরিলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বাঞ্ছারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠাকুর, কি হ'ল?"

ছাতা ও লাঠী গাছটি মাটিতে ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "হল আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

"তবু কি রকম ?"

"আরে মশাই ছেলে তো একটা জামার দোকানে খাতা লেখে, মাসে ১০৲ টাকা মাইনে পায়। তার দাদা তাইতেই তিনশো টাকা নগদ, ১০ ভরি সোণা, আর ২৫ ভরি রূপো চায়! থাক্‌গে, আমার মেয়ে আইবুড়ো থাকবে, না হয় বিয়ে না হবে।"—ব্রাহ্মণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

হাত মুখ ধুইয়া তিনি একটু শান্তভাব ধারণ করিলে বাঞ্ছারাম বলিল, "তা মশাই, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি"—বলিয়া হস্তদ্বয় যোড় করিল।

ব্রাহ্মণও তৎক্ষণাৎ হাতযোড় করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে সে কি কথা! বলুন না যা বলবেন, এর আর ভয় অভয় কি।"

"না তবু"—বলিয়া একটী ঢোক গিলিয়া বাঞ্ছারাম বলিতে আরম্ভ করিল—"দেখুন, আমার ছেলেটীর বয়স প্রায় ঘেটের কোলে বাইশ তেইশ বছর হবে। আজ কালকার কালে এল-এ, বি-এ পড়িয়েও সেই বিশ ত্রিশ টাকার চাকরি বই যখন আর কিছু জুটবে না, তখন শুধু শুধু আর পড়ে লাভ কি ? সেই জন্যেই ছেলেটীকে আমি আর এল-এ, বি-এ পড়াই নি। তবে ইংরেজী বেশ শিখেছে। বলেইছি তো, ঈশ্বরেচ্ছায় এই কল্‌কাতা সহরে আমার চার খানা হোটেল চল্‌ছে। তাতে খুব কম করে ধল্লেও মাসে ১০০।১৫০৲ টাকা আয় হয়। আর ওইটীই আমার একমাত্র পুত্তুর সন্তান। তা আপনার কথাটা শুনে পর্য্যন্ত আমার মনটায় কেমন যেন ঐ রকম কথাটা উঠ্‌ছিল। যদি আপনার কোন অমত না থাকে, আর মেয়েটি যদি ভাল হয়, তা হলে আমি বলছিলাম কি, যে আমার ছেলেটির সঙ্গেই কেন শুভকার্য্য করুন না।"

সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে এই শুভসংবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণ আনন্দে

উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। দেখ্‌চেন তো কন্যাদায়"—

বাঞ্ছারাম বলিল, "বলেন কেন। কন্যাদায় যে কি ভীষণ বস্তু, সে কথা আর বলে কষ্ট পান কেন? সেই জন্যেই তো বলছিলাম।"

ব্রাহ্মণ ছেলেটির গণ, পরিচয় প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। বাঞ্ছারাম যাহা বলিল, সমস্তই ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাঃ এ যে রাজযোটক একেবারে।"

"আজ্ঞে যা বলেন। মেয়েটী যদি দেখতে শুন্‌তে ভাল হয়, তা হলে আমার তো কোন অমতই নেই। আপনিও অবস্থাবান নন, তা ছাড়া ঘর বরও যখন মিলে যাচ্ছে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "আজ্ঞে, বাপ হয়ে আর নিজ মুখে কি করে বলি, মেয়েটি দেখলেই বুঝবেন যে যথার্থ লক্ষ্মীপ্রতিমা কি না।"

ব্রাহ্মণ টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বাঞ্ছারাম বিনীতভাবে তাঁহাকে জানাইল যে, কন্যাটি যদি তাহার মনোনীত হয়, তাহা হইলে এক পয়সাও সে লইবে না। পরের অর্থ লইয়া এ পর্য্যন্ত যে কেহ ধনশালী হইতে পারে নাই সে বিষয়েও প্রচুর উদাহরণ দেখাইল। অবশেষে স্থির হইল যে প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ পাত্র দেখিবেন, তারপর স্বয়ং মুখোপাধ্যায়-কুলতিলক বাঞ্ছারাম ব্রাহ্মণের সহিত যাইয়া কন্যা দেখিয়া আসিবে।

কন্যাদায়গ্রস্থ ব্রাহ্মণের বক্ষস্থল হইতে যেন পাষাণভার অপসৃত হইল। আনন্দে ও উৎকণ্ঠায় সে রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

* * * *

হোটেল-বাটীরই অপর অংশে বাঞ্ছারামের পরিবারবর্গ থাকিত। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া সে অন্তঃপুরে যাইয়া স্ত্রীকে বলিল, "রামার মা, বড় ভাল খবর।"

নথ দুলাইয়া রামজননী ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। এমন সময়ে বাঞ্ছারামের কনিষ্ঠ সহোদর শিবরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঞ্ছারাম তাহাকেও আসন্ন শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিল।

ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে তাঁহার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত কথা, এবং তাহার প্রস্তাব ভ্রাতা ও স্ত্রীকে আনুপূর্ব্বিক জানাইয়া সে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল, "এইবার কিস্তি!"

শিবরামটি একটু ভাল মানুষ। সে অগ্রজের কথা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া 'কিস্তির' ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিল।

বাঞ্ছারাম স্বর একটু নীচু করিয়া বলিল, "ওরে গোমূখ্যু, তবে শুনলি কি! ওই যে ঠাকুরটি এসেছেন, নৈকুষ্যি কুলীন, ওঁর মেয়ের সঙ্গে রামার বিয়ে দেব। কাল মেয়ে দেখতে মগরা যাব। খালি পদবীতেই বামুন হয়েছি বৈ ত নয়, এবার যদি কুলীন বামুনের ঘরে ছেলের বিয়ে দিতে পারি, তা হলে একেবারে কেল্লা তো ফতে করবো।"

শিবরাম চমকিত হইয়া বলিল, "সে কি দাদা, বামুনের মেয়ের সঙ্গে রামার বিয়ে দিবে কি গো! ঢের পাপ করেছ দাদা, এমনিই বামুন কায়েতকে আমাদের ছোঁয়া অন্ন খাওয়াচ্ছি, তাতেই আমাদের পাপের সীমে নেই। তার ওপর আবার যদি বামুনের মেয়ে ঘরে আনো, তা হলে তো একেবারে ছিষ্টি উড়ে যাবে। আমাদের ধোপার ঘরে—"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বাঞ্ছারাম বলিল, "ইউ হতভাগা!—ধোপা ধোপা করে চেঁচাতে লাগলো! ওরে, ধোপা কে রে? এর ভেতরে আবার ধোপা কোথায় পেলি? মুকুর্য্যে ঘরের ছেলে আমরা, ঠাকুদ্দা ছিলেন টোলের পণ্ডিত, তোকে তো আর তালিম দিয়েও পেরে উঠিনে।"

ধোপাগিন্নীও নথ সঞ্চালন করিয়া বলিল, "সত্যি, ও কি ঠাকুরপো, কথায় কথায় অমনি রজকের ঘর, রজক, ও কি ও সব।"

বাঞ্ছারাম বলিল, "ওই বেটাই কোন দিন মজাবে দেখছি।"

শিবরাম চুপ করিয়া রহিল। ছেলে দেখান সম্বন্ধে গৃহিণীকে নানা প্রকারের উপদেশ দিয়া, পুত্রকেও বুঝাইয়া, ভ্রাতাকে ধোপা সম্বন্ধীয় কোন কথা উচ্চারণ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া বাঞ্ছারাম হোটেল-ঘরে ফিরিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ তখন নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ান।

[৪]

ছেলে দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অমত হইবার কোন কারণ ছিল না। দিব্য ফিট বাবু, সুশ্রী পাত্র, তাঁহার ভাবী জামাতা হইবে ইহা মনে করিয়া তিনি বরং আহ্লাদিতই হইলেন। এক পয়সাও দিতে হইবে না, অথচ এমন পাত্র মিলিতেছে এবং রাশি গণ অনুসারে রাজ-যোটক হইতেছে, ইহা যে তাঁহারই কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা বাঞ্ছারাম বেশ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল। আনন্দে ব্রাহ্মণের চক্ষে জল ঝরিতে লাগিল।

তিনি বলিলেন, "আর পাঁচবার অনর্থক যাওয়া আসা করেই বা লাভ কি, আমি বাবাজীকে একেবারে আশীর্ব্বাদ করেই যাই। ছেলে আশীর্ব্বাদে তো আর কোন দোষ নেই।"

পুরোহিত প্রভৃতির কথা উত্থাপন করিলে বাঞ্ছারাম বাধা দিয়া বলিল, "যখন ভগবানের ইচ্ছায় শুভ হচ্ছে, তখন তাঁরই ইচ্ছায় সবই শুভ হবে। কি করবেন আর পাঁজি পুরুত নিয়ে? আপনি অমনিই আশীর্ব্বাদ করুন না!"

ব্রাহ্মণ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ব্যাগের ভিতর হইতে একটী ক্ষুদ্র থলি বাহির করিয়া, তাহা হইতে পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া বাঞ্ছারামের পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্থির হইল যে সেই দিনই অপরাহ্নের ট্রেণে বাঞ্ছারাম ব্রাহ্মণের সহিত মগরা যাইয়া কন্যা দেখিয়া আসিবে।

কন্যা দেখিয়াও বাঞ্ছারামের বেশ পছন্দ হইল। তবে বলিল, "মেয়েটি বড় ছোট। তা হোক, বিয়ের জল গায়ে পড়লে পন্ পন্ করে বেড়ে উঠবে।" বিশিষ্ট ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে নিজকে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে একখানি গিনি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। সমাগত ভদ্রমণ্ডলী তাহার পরিচিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম জানিতে চাহিলে, সে কয়েকজন কাল্পনিক রাজা-মহারাজার নাম করিয়া বসিল। রাজসভায় গমন করিয়া চট্টোপাধ্যায়ের নূতন বৈবাহিকের পরিচয় অনুসন্ধান করা বিশেষ সুবিধাজনক হইবে না বুঝিয়া প্রশ্নকর্ত্তাগণ রণে ভঙ্গ দিলেন। বিজয়োল্লাসে বাঞ্ছারাম কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। বিবাহের দিনও স্থির হইয়া গেল।

অবশেষে নির্দ্দিষ্ট দিনে রজকপুত্রের সহিত ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হইয়া গেল। বাঞ্ছারাম বিবাহে যথেষ্ট খরচ করিল। গ্রামের লোকও ব্রাহ্মণের বৈবাহিকের বদান্যতায় মুগ্ধ হইয়া গেল। স্কুলের পণ্ডিত বড় জোর ৫৲ টাকা পাইবেন আশা করিয়া তাহার নিকট স্কুলের খাতায় চাঁদা দিতে অনুরোধ করিলেন, বিনা বাক্যব্যয়ে বাঞ্ছারাম একখানি দশটাকার নোট ফেলিয়া দিল। সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

এইরূপে বাঞ্ছারামের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল।

[৫]

অষ্টাহ পরে কন্যা শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া একদিন পিতাকে অতি নিভৃতে বলিল, "বাবা! ওরা বামুন নয়, ধোপা!"

ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাহ্নিক করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কন্যার কথা শুনিয়া চমকিত হইলেন। সন্ধ্যাহ্নিক মাথায় উঠিল। ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "চুপ, চুপ, চেঁচাস নে। বলিস্ কিরে হতভাগা মেয়ে!"

ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যা আবার বলিল, "হ্যাঁ বাবা, সত্যি সত্যিই ওরা ধোপা।"

ব্রাহ্মণ রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন, "ন্যাকামো করিস্ নে, লোকে যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়, তা হলে কেউ বিশ্বাস কর্ব্বে না যে তুই মিছে কথা বলছিস্। তখনি আমাকে জাতে ঠেলবে। খবরদার! ওসব ন্যাকামো কর্ত্তে যাস্ নে।"

কন্যা স্বর অপেক্ষাকৃত নিম্ন করিয়া বলিল, "সত্যি বাবা, সত্যি বলছি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, ওরা বামুন নয়, ওরা ধোপা।"

চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কি করে জানলি?"

কন্যা বলিল, "সেদিন আমার শাশুড়ী শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করে বলছিলেন যে, আমার একটি ছেলে, অন্য জায়গায় বিয়ে দিলে কত টাকা, কত গহনা দিত, এমন জায়গায় বিয়ে দিলে যে এককড়া কাণা-কড়িও দিলে না। আমার শ্বশুর রেগে মেগে বল্লেন, 'তাইতো! আমাদের ধোপার ঘরে কুলীন বামনের মেয়ে এনেছি, সেই আমাদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি, তার ওপর আবার গহনা'—আমি আড়াল থেকে শুনছিলাম।"

ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কন্যার হাত দুখানি ধরিয়া তিনি বলিলেন, "ক্ষেপী! আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর যে, এ যা বল্লি তা বল্লি, কারুকাছে এ কথার বাষ্পও প্রকাশ করবি নে।"

কন্যা পিতার পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কোশাকুশী রেখে দে, আমি আর সন্ধ্যে করবো না। আমি এখনিই কলকাতায় যাচ্ছি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে

কোথায় গিয়েছে, তা হলে বলিস যে, কোথায় গিয়েছে তা জানিনে। রাত্রে দোরে চাবী বন্ধ করে চৌধুরীদের বাড়ী গিয়ে শুয়ে থাকিস্। ওদের কাছেও বলিস্ যে কোথায় গিয়েছে জানি না।"

দ্বিতীয় কথা না বলিয়া ব্রাহ্মণ চাদর কাঁধে করিয়া, ব্যাগ লইয়া, ছাতা ও লাঠী হাতে করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলেন।

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তখন যেন আগুন ছুটিতেছিল। প্রবল জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির যেরূপ শারীরিক অবস্থা হয়, তাঁহারও সেইরূপ হইয়াছিল।

ষ্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কলিকাতাগামী ট্রেণ ধরিয়া যখন তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি হইয়াছিল।

হোটেলে আসিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বৈবাহিক সান্ধ্যবায়ু সেবনার্থ অপরাহ্ণেই বাহির হইয়াছেন। এমন সময় দেখিলেন যে হুঁকা হাতে করিয়া শিবরাম অন্তঃপুর হইতে আসিতেছে। সে সহসা আসিয়াই বৈবাহিককে এভাবে দেখিয়া যথেষ্ট বিস্মিত হইল। একবার ঢোক গিলিয়া, বলিল, "বেইমশাই যে, কতক্ষণ!" বলিয়াই হুঁকা রাখিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্তস্থিত হুঁকা দিতে গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "থাক, এখন আর তামাক খাব না।"

বাঞ্ছারামের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া শ্যামাচরণ জানিলেন যে কি একটা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তিনি বাহির হইয়াছেন; রাত্রে ফিরিবেন কি না সন্দেহ।

ব্রাহ্মণ বসিলেন। শিবরাম অন্তঃপুরে খবর দিতে উদ্যত হইলে হইলে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "না, এখনিই আমি যাব।"

এ কথা ওকথার পর বাঞ্ছারামের দেশের কথা উঠিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বেই তোমাদের পৈতৃক ভিটেটা একেবারে ছেড়ে দিও না।

সেখানে ঘরদোর মেরামত করে একটা আস্তানা রেখে দাও। কলকাতায় থাক্‌লে আজকাল ছেলেরা একেবারে বাবু হয়ে যায়। তবু দেশভুঁই আছে বুঝলেও সে দিকে একটা টান থাকে।"

শিবরাম এ কথায় একটু চমকিয়া উঠিল। বলিল, "হ্যাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু আমরা বহুকাল সে দেশ ছেড়ে এসেছি। এখন আর কেউ সেদিকে যায়ও না, ভিটে হয়তো এতদিনে জঙ্গল হয়ে গেছে।"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামটা কোথায়?"

শিবরাম স্বভাবতই একটু ভালমানুষ। সে অত বুঝিল না, বলিল, "সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার বাঁকুড়া জেলার চাপড়ামুখী গ্রাম।"

কোন রাস্তা দিয়া, কি উপায়ে সেখানে যাইতে হয় তাহাও অনেক জেরায় অবগত হইয়া শ্যামাচরণ উঠিলেন।

শিবরাম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "সে কি বেইমশাই, এখনিই যাবেন কি রকম? একি পরের বাড়ী পেলেন?"

একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না তা নয়। একটা কাজের জন্যে কলকাতায় এসেছিলাম, বাড়ী যাচ্ছি, ভাবলাম একবার দেখাটা করে যাই তোমাদের সঙ্গে।"

শিবরাম বলিল, "তা বেই মশাই, রাত্তিরটা থেকে গেলে হোত, না হয় কিছু জলযোগ করে যান, আপনার বেন শুনলে—"

সেকথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্যামাচরণ উঠিলেন। শিবরাম বৈবাহিকের এ আচরণে যথেষ্ট বিস্মিত হইল।

[৬]

সেই রাত্রেই শ্যামাচরণ হাবড়ায় আসিয়া ট্রেণ ধরিলেন। নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে নামিয়া অনেক জিজ্ঞাসা প্রভৃতি করিয়া যখন চাপড়ামুখী গ্রামে

পৌঁছিলেন তখন প্রভাত হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি অনাহার ও জাগরণ, তদুপরি মানসিক দুশ্চিন্তায় তাঁহাকে যেন অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় দেখাইতেছিল।

দুই একজনের কাছে সন্ধান লইয়া তিনি জানিলেন যে গ্রামের জমীদারের পুরাতন দেওয়ান রাধানাথ মিত্রই গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

শ্যামাচরণ তাহা শুনিয়া গ্রামের কাছারী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মিত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি তখন বসিয়া কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আর একটি বৃদ্ধ ধূমপান করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিবামাত্র উভয়েই হস্তোত্তোলন করিয়া প্রণাম করিলেন। মিত্র মহাশয় বলিলেন, "আসতে আজ্ঞা হয় ঠাকুর।"

"জয়োঽস্তু" বলিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "আমি এ গ্রামে এসেছিলাম একটু কাজে। শুনলাম আপনিই নাকি গ্রামের মধ্যে প্রাচীন লোক; তাই আপনার কাছেই এসেছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আসুন, বসুন। কি ব্যাপারটা বলুন। আমি এখানকার বাবুদের দেওয়ান। দুপুরুষ ধরে এদের কাজ কচ্ছি।"

অপর বৃদ্ধটী হস্তস্থিত হুঁকাটী ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ তো? আসুন, তামাক ইচ্ছে করুন।"

হুঁকাটি হাতে করিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা আমি জান্‌তে চাই। আপনাদের এ গ্রামে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলে কোনও ব্রাহ্মণ বাস করতেন?"

দেওয়ানজী ভ্রূদ্বয় একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মুকুয্যে? নবীন

মুকুয্যে? ত্রিশ বছর আগে? কই মনে তো পড়ছে না!"—বলিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট বৃদ্ধটীকে বলিলেন, "তুমি জান হে?"

তাঁহার বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন, "কই না, নবীন মুখুয্যে বলে তো কেউ কখনও আমাদের গ্রামে বাস করত বলে মনে হয় না। মোটে একঘর ব্রাহ্মণ আছে এ গ্রামে, তারাও আবার ভট্‌চায্যি।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "তা হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হন আগে, তার পর কথা হবে এখন। কি, ব্যাপারটা কি? কি জন্যে বলুন দেখি?"

শ্যামাচরণ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা নবীন ধোপা বলে কেউ থাকতো?"

দেওয়ানজী ও সেই বৃদ্ধ উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধটী বলিলেন, "ধোপা! মুকুয্যে থেকে একেবারে ধোপা। হ্যাঁ, নবীন ধোপা ছিল বটে, কিন্তু সে তো বহুকালের কথা। আমরা ছোট বেলায় নব্‌নে ধোপা নব্‌নে ধোপা কর্ত্তাম।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "হ্যাঁ প্রায় বিশ ত্রিশ বছরের কথা হবে।"

বৃদ্ধটী বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই রমকই বটে, সে কি আর আজকের কথা মশাই? তাদের ঘর ছিল ওই বেলেপুকুরের ধারটায়। সেখানে এখন বনজঙ্গল হয়েছে। সে তো বহুদিন দেশত্যাগী হয়ে গেছে। কোথায় গিয়েছে তাও কেউ জানে না। দুটী ছেলে ছিল তার, বাঞ্ছারাম আর শিবুরাম।"

ব্রাহ্মণের ধমনীতে রক্তস্রোত দ্রুত বহিতে লাগিল। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। তিনি উঠিলেন। দেওয়ানজী তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়া তবে আহারাদি করাইলেন। এ অনুসন্ধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু শ্যামাচরণ কোন কথাই বলিলেন না।

দ্বিপ্রহরে সেখান হইতে রওনা হইয়া শ্যামাচরণ সন্ধ্যাকালে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

[৭]

ষ্টেশনে নামিয়া, হোটেলে আসিয়া, কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ব্রাহ্মণ একেবারে উপরে উঠিয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই একখানি তক্ত-পোষের উপর বাঞ্ছারাম একটি তাকিয়া ঠেশান দিয়া উপবিষ্ট, হোটেলের সেই খোঁড়া ঝি, তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। হঠাৎ বৈবাহিককে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখিয়া বাঞ্ছারাম একটু চমকিত হইল। তারপর বলিল, "এ কি, এযে কাশীতে ভূমিকম্প! বেই মশাই যে হঠাৎ? আসতে আজ্ঞা হয় বসুন।"

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া শ্যামাচরণ সেই তক্তপোষের উপর বসিলেন। তাঁহার মুখ তখন আষাঢ়ের জলভরা মেঘের ন্যায় গম্ভীর।

বাঞ্ছারাম বলিল, "এহে, মুখটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে, দেখছি, দুপুরের রৌদ্রে খুব ঘুরেছিলেন বুঝি?"—বলিয়াই ঝিকে হাত-মুখ ধুইবার জল আনিতে আদেশ করিল।

কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বলিলেন, "থাক্ আর হাত-মুখ ধোব না।" বলিয়াই মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"বাপু, জেনে শুনে গরীব ব্রাহ্মণের এ সর্ব্বনাশ কল্লে কেন?"

ব্রাহ্মণের চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিয়া উঠিল।

বাঞ্ছারাম বলিল, "সে কি বেই, কি হয়েছে? অমন কচ্ছেন কেন?"

চাদরের প্রান্তভাগে অশ্রু মুছিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "অমন কচ্ছি কেন, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছ? তা বাবু, আমার ত সব গিয়েছিল, কেবল

মেয়েটির মুখ চেয়ে সব ভুলে ছিলাম, ভাবতাম যে ওর বিয়ে দিয়ে আবার নূতন করে ঘরসংসার পাতাব। তুমি সব জেনে শুনে ধোপার ছেলে হয়ে কি সাহসে আমার এ সর্ব্বনাশটা কল্লে বল দেখি? এতে কি তোমার ভাল হবে ভাবছ?"

ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন।

বাঞ্ছারাম চমকিত হইল। একবার কাসিয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "শিবে!"

শিবুরাম আসিল। রোষকষায়িত লোচনে বাঞ্ছারাম তক্তপোষের তলা হইতে নিজের চটিজুতা বাহির করিয়া ভ্রাতার গণ্ডে সজোরে এক আঘাত করিয়া বাঞ্ছারাম বলিল,"বেরো হারামজাদা, আমার বাড়ী থেকে! যার খাস্ তারই কুচ্ছো গাওয়া, বুকে বসে দাড়ি ওপড়ান!"

বাধা দিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ওকে মার কেন? ও নিরীহ লোক, ও আমায় কিছু বলেনি। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বোজ উঠেছে, কতদিন আর চেপে রাখবে বাপু?"

শিবুরাম ব্যাপারখানা বুঝিয়া লইল। সে বলিল, "আমায় মারলে কেন দাদা, আমি ত গোড়াতেই বলেছিলাম যে একাজ কোরো না। যা পাপ করেছ তা করেছ, এত বড় পাপ ধর্ম্মে সবে না।"

বাঞ্ছারাম চীৎকার করিয়া বলিল, "এ নিশ্চয়ই তোর কাজ, পাজি নচ্ছার কোথাকার!"

ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া বলিলেন, "কেন মিছে ও বেচারীকে মারছ?" আমি অন্য উপায়ে জেনেছি। তা, ছোটলোক ব্যাটা, ধোপার ঘরে জন্মে বামুনের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিলে, উচ্ছন্ন যাবে না? মাথায় বজ্রাঘাত হবে না? সপুরী একগড় হবে না? ব্রাহ্মণের চোখের জল ফেলিয়ে, ব্রাহ্মণের মনে আঘাত দিয়ে——"

ক্রোধে ব্রাহ্মণের কথা আর উচ্চারিত হইল না তিনি সজোরে নিজের উপবীত ছিঁড়িয়া সেই চটিজুতার উপর ফেলিয়া দিলেন।

"হাঁ হাঁ ঠাকুর করেন কি, করেন কি," বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে শিবুরাম পৈতাগাছটি জুতা হইতে তুলিয়া নিজের মাথায় রাখিল।

বাঙ্গারাম একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সে বলিল, "ঠাকুর স্থির হোন।" বলিয়া বৈবাহিকের একখানি হাত ধরিল। ব্রাহ্মণ সবেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "বেল্লিক, ছাড়! আবার হাত ধরতে এসেছে।"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বাঙ্গারাম বলিল, "তা ঠাকুর, যখন টের পেয়েছ, তখন পেয়েইছ, আমি আর গোপন কর্ত্তে চাইনে। কিন্তু এ কথাটা নিয়ে বেশী ঢলাঢলি হলে আমার বড় কিছু হবে না, কিন্তু আপনার মাথাটা কাটা যাবে। আকাশে থুতু ফেল্‌লে নিজের মুখেই পড়বে।"

দন্তে দন্তে পেষণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোর রক্তে আমি নাইবো। বেটা ধোপা, এসেছিস ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট করতে! চোদ্দ-পুরুষে নরকবাস ঘুচবে না।"

বাঙ্গারাম নীরব রহিল। ব্রাহ্মণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বাঙ্গারাম আবার বলিল, "ঠাকুর শোন। যা হয়ে গিয়েছে তার ত আর কোন চারা নেই, কাজ কি আর এ কথা নিয়ে বেশী হাঙ্গামা করে? যখন সব জেনেছ, তখন আর গোপন করেই বা কি করবে, কিন্তু আমি যে রজকের ছেলে সে কথা বাইরের আর কেউ জানে না, এমন কি আমার ছেলেও জানে না। তা, আর একথা আন্দোলন না করে যেমন চলছিল তেমনই চলুক না কেন?"

ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "চোপরাও হারামজাদা ব্যাটা! তুই ধোপা একথা আমি চেপে যাব? ঢাক বাজিয়ে বেড়াব না!"—বলিয়াই বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন—"শোন সকলে, শোন রাস্তার লোক সকলে, এ বাঞ্ছারাম বামুন নয়, এর চোদ্দপুরুষেও কেউ বামুন ছিল না, এ ধোপা, ধোপা, এটা ধোপার হোটেল। শোন সকলে, এটা ধোপার হোটেল।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখানে লোকারণ্য হইয়া গেল। পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকজন দোকানদার কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া কুপিত ব্রাহ্মণ ও বাঞ্ছারামের মধ্যবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "কিছুই ত বুঝতে পারছি নে। বেই মশাই হঠাৎ এসে বসেই বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন, আমি তাতে একটু ঠাট্টা বোটকেরাও করেছিলাম। এই আর কি, অগ্নিশর্ম্মা হয়ে একেবারে যাচ্ছেতাই আরম্ভ করেছেন।"

হোটেলের নীচে যে মুদী থাকিত, সে বলিল, "তাই তো, বেইয়ের মাথাটাথা খারাপ হয় নি তো?"

ভীড়ের ভিতর হইতে ৫।৭ জন ব্যাপার কি জানিবার জন্য অত্যন্ত ছটফট করিতেছিল, উক্ত মুদী তাহাদিগকে জানাইল যে, সব 'ঘরোয়া' ব্যাপার মাত্র, সুতরাং ঘটনা কি জানিবার জন্য তাহাদের মস্তিষ্কবেদনার কোন প্রয়োজন নাই। "ছি, ছি, ধোপার হোটেলে ভাত খেয়ে কত লোকের জাত গেছে"—"কি ঘোর কলি!"—প্রভৃতি নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে জনতা অন্তর্হিত হইল।

ব্রাহ্মণ তখনও ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর,তাঁহার মুখ দিয়া আর বাক্য নিঃসৃত হইতেছিল না। বারান্দার রেলিং ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে-ছিলেন, মুখ ও চক্ষু ক্রোধে লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

মুদী তখন বলিল, "বেই মশাই, কি ব্যাপার? আজ একটু 'মাত্রা' চড়িয়েছিলে নাকি?"

ব্রাহ্মণ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। মুদী তাহা দেখিয়া বাঞ্ছারামকে বলিল, "মাথা বিগড়েছে।

বাঞ্ছারাম বলিল, "নিশ্চয়ই।"

মুদী আবার বলিল, "তা, এখন তোমারই ঘাড়ে যখন চেপেছেন, তখন উপায় তোমাকেই কর্ত্তে হবে।"

বাঞ্ছারাম মহা চিন্তার ভাণ করিয়া বলিল, "তাই তো, কি ব্যবস্থাই বা করি? বড় ভাবিয়ে তুল্লে ত! ছেলের বিয়ে দিয়ে, ঘরের কড়ি খরচ করে ঝক্‌মারি তো কম নয়।"

মুদী বলিল, "এক কাজ কর। তোমরা সবাই ধরাধরি করে ওঁকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে, ডাবের জলে বরফ দিয়ে বেশ করে ওঁর মাথাটা ধুইয়ে দাও। তারপর আমার দোকান থেকে পয়সা কতকের মাখন কিনে এনে তাই মাথায় থাবড়ে দাও। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলেই সব সেরে যাবে এখন।"

মুখখানা ভারি করিয়া বাঞ্ছারাম বলিল, "অগত্যা তাই করতে হবে বৈ কি।"—বলিয়াই বৈবাহিককে বলিল, "বেই মশাই, আসুন এ দিকে বাড়ীর ভিতর।"

ব্রাহ্মণ তথাপি কোন উত্তর দিলেন না। বাঞ্ছারাম তখন তাঁহার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "আসুন।"

দলিত সর্পের ন্যায় ব্রাহ্মণ গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"সরে যা, হারামজাদা ব্যাটা।"

বাঞ্ছারাম মুদীর দিকে চাহিয়া বলিল, "একেবারে উন্মাদ পাগল।"

মুদী বলিল, "তাই তো। আচ্ছা এস, আমিও ধরছি, তুমি একখানা

হাত ধর, শিবুঠাকুর আর একখানা হাত ধরুক, আমি কাঁকালটা ধরছি। এই রকম ধরাধরি করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে চল। আহা, পাগল ছাগল মানুষ!"

অবশেষে সেইরূপ করা হইল। বাঞ্ছারাম ও শিবুরাম উভয়ে ব্রাহ্মণের হস্তদ্বয় ধারণ করিল এবং পশ্চাৎ হইতে মুদী ঠেলা দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "উহুঃ বাবারে। মেরে ফেল্লে রে।"

"চুপ চুপ বেই, এখনই থানা পুলিস এসে পড়বে, কর কি? চল ডাবের জলে নাইয়ে দিই গে।"

ব্রাহ্মণের শত বাধা সত্ত্বেও সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে সেই রাত্রিকালে বরফ দ্বারা শীতলীকৃত ডাবের জলে স্নান করাইয়া উত্তমরূপে তাঁহার বিরলকেশ-মস্তকে মাথন মাথাইয়া দিল।

ফলে যাহা হইবার তাহা হইল। ব্রাহ্মণের দেহ ও মন উভয়ই অত্যন্ত ক্রোধ ও উত্তেজনার ফলে অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরেই বরফসহ ডাবের জলে স্নান ও মাথন মর্দ্দনে একঘণ্টা পরেই তাঁহার প্রবলবেগে জ্বর আসিল।

সেই হোটেল-ঘরের এক জীর্ণ তক্তপোষের উপর একখানি মাদুর বিছাইয়া তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্মণ তাহাতেই শয়ন করিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

রাত্রে তাঁহার জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, তিনি কেবল ছটফট করিতে লাগিলেন। পিপাসায় অস্থির হইয়া উঠিলেন।

শেষ রাত্রে বাঞ্ছারাম ও তাঁহার গৃহিণী সবিস্ময়ে দেখিল যে অত্যন্ত জ্বরের প্রকোপে তাহাদের বৈবাহিক সংজ্ঞাশূন্য।

ধোপাবউ বলিল, "এখন এ মুদ্দোরের উপায়?"

বাঞ্ছারাম একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "তাই তো!"

সে উপদেশ দিল, "হাঁসপাতালে দাও না কেন ?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "সেটা কি ভাল হয় ? লোকে বলবে কি ?"

মুখ বাঁকাইয়া নথ দুলাইয়া ধোপাবউ বলিল, "রেখে দাও তোমার লোক। কেলেঙ্কারি করে লোক জমা করবার বেলায় লোক কোথায় থাকে ?"

বাঞ্ছারাম ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে গৃহিণীর নথেরই জয় হইল।

প্রত্যূষে শ্যামাচরণ বাঞ্ছারাম কর্ত্তৃক মেয়ো হাঁসপাতালে নীত হইলেন।

[৮]

প্রায় দুই সপ্তাহকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিবার পর শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় আরোগ্যলাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে মুক্ত হইলেন। এই কয়দিনের মধ্যে বাঞ্ছারাম একদিন মাত্র বৈবাহিককে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু অভিমানী ব্রাহ্মণ বৈবাহিকের সহিত বাক্যালাপও না করিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়াছিলেন।

হাঁসপাতাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বাঞ্ছারামের বাটীর রাস্তাও আর না মাড়াইয়া একেবারে আহিরীটোলার ঘাট হইতে গঙ্গা পার হইয়া শালকিয়া যাইয়া তথা হইতে হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া দেশের ট্রেণে উঠিলেন।

তাঁহার এই দীর্ঘ অদর্শনে তাঁহার কন্যা অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছিল, চৌধুরীরাও যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে পিতাকে দেখিয়া কন্যা বলিল, "বাবা, এতদিন কোথায় ছিলে বাবা। এ কি চেহারা হয়েছে তোমার ?"

কিন্তু পিতা কোন উত্তর দিলেন না। কন্যা দেখিল যে তাঁহার মুখখানি বড়ই গম্ভীর। সেও :সাহস করিয়া তখন আর কিছু বলিল না।

আহারাদির পর ব্রাহ্মণ কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ক্ষেপী! তোর বাক্স, তোরঙ্গ যা কিছু আছে সব গুছিয়ে নে।"

"কেন বাবা?"

রুক্ষস্বরে শ্যামাচরণ বলিলেন—"অত নিকেশ তোকে আমি দিতে পারবো না। যা বলছি কেবল তাই শোন।"

পিতার এই আচরণে ক্ষেপী যথেষ্ট বিস্মিত হইল এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা, কোথায় যাবে?"

এক নিশ্বাসে শ্যামাচরণ কেবলমাত্র বলিলেন—"কাশী যাব" বলিয়াই সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

ক্ষেপী পিতার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। ভিতরে যে এতখানি ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

সেই রাত্রেই কাহাকে কিছু না বলিয়া যৎসামান্য তৈজস্‌পত্র লইয়া কন্যাসহ ব্রাহ্মণ গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন।

* * * * *

সহসা একদিন বৈবাহিককে দেখিতে আসিয়া বাঞ্ছারাম দেখিল যে, যে লৌহখট্টা তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে এক বিশালকায় হিন্দুস্থানী মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া শুইয়া আছে। হাঁসপাতালের রোগিগণকে মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করা হয় তাহা বাঞ্ছারাম জানিত, সুতরাং সে বিশেষ বিস্মিত না হইয়া একজন জমাদারকে ব্রাহ্মণের সমাচার জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু জমাদার যখন জানাইল যে রোগী রোগমুক্ত

হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে, তখন বাঞ্ছারামের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ব্রাহ্মণের কৃতজ্ঞতার উপর অশেষ দোষারোপ করিতে করিতে বাঞ্ছারাম হোটেলে ফিরিয়া আসিল।

ধোপাবউ এই সংবাদ শুনিয়া বলিল, "আমি তখনই বলেছিলাম যে ছোটলোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিও না। তা তুমি শুনলে না, একেবারে বামুন দেখে ঢলে পড়লে। কেমন এখন হল ত!"

বাঞ্ছারাম বলিল, "আচ্ছা, আমি কালই সকালের টেরেণে মগরায় যাচ্ছি। বামুন বোধ হয় আমার উপর রাগ করেছে।"

মুখখানি বিকৃত করিয়া ধোপাবউ বলিল, "ওরে আমার রাগ করুনি গো! এত কল্লুম, তবুও রাগ! কি কত্তে যাবে তুমি সেই লক্ষ্মীছাড়ার দেশে? বরং কড়া করে এক চিঠি লিখে দাও, যেন পত্তর পাঠ আমার সমস্ত গহনা ফিরিয়ে দিয়ে যায়। দেব না তো আমি একখানা গয়নাও অমন হাঘরের মেয়েকে, বয়ে গিয়েছে দেবার জন্যে।"

কিন্তু বাঞ্ছারাম স্ত্রীর উপদেশ শিরোধার্য্য না করিয়া পরদিন প্রভাতের ট্রেণেই মগরা যাত্রা করিল। যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া দেখিল যে বাড়ী খালি, আবশ্যকীয় তৈজসপত্রাদিও কিছু নাই। অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও গ্রামের লোকের নিকট কোন সন্ধান মিলিল না। সুতরাং সে হতাশচিত্তে দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

ধোপাবউ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল?"

বাঞ্ছারাম ব্যাপার বলিল। কিন্তু ধোপাবউ সপ্তমে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আমার গহনা! ওগো আমার সব গহনাগুলো গেল যে। ওগো, তোমার কথা শুনেই তো আমি ছুঁড়িকে আমার গা থেকে পর্য্যন্ত সব গহনা খুলে পরিয়ে দিলুম গো। এখন কি হবে? ঐ জন্যে যখন বাপের বাড়ী যায়, তখন পই পই করে বল্লুম যে ওগো গহনা খুলে নিই, ওগো গহনা

খুলে নিই। তা নয়, তুমিই ত তখন ঢং করে বল্লে যে সেটা কি ভাল দেখায়? এখন দেখাও ভাল! এখনও ভাল চাও ত নিয়ে এসো আমার সব গহনা। প্রায় হাজার দেড় হাজার টাকার গহনা—আমার সব গেল গো! ওগো আমার যে সর্ব্বস্ব গেল গো!"

ধোপাগিন্নীর আর্ত্তনাদ ক্রন্দনে পরিণত হইল। বাঞ্ছারাম নিরুত্তর ছিল। তাহা দেখিয়া সে পুনরায় বলিল; "পুলিসে খবর দাও, সব হুলিয়ে করে দাও, চেহারা ছাপিয়ে দাও। জোচ্চোর মিন্সেকে আমি নাকের জলে চোখের জলে করিয়ে তবে ছাড়বো। এখনও হয়েছে কি!"

গহনার শোকে অধীরা রজকপত্নীর মুখে সেদিন আর অন্নগ্রাস উঠিল না। পরিচিত সকলের সহিতই ঘোর পরামর্শ হইতে লাগিল যে কি উপায়ে গহনাগুলির পুনরুদ্ধার হইতে পারে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বাঞ্ছারাম বহু সন্ধান করিয়াও বৈবাহিক ও পুত্রবধূর কোন খোঁজ পাইল না।

[৯]

তাহার পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

এই তিন বৎসরে বাঞ্ছারামের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার কলিকাতার হোটেলগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন সে বৰ্দ্ধমানে আসিয়াছে। শ্যামাচরণ যেদিন বারান্দা হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—"এ বামুনের হোটেল নয়, এ ধোপার হোটেল"—সেই দিন হইতেই বাঞ্ছারামের মনে শঙ্কা জাগিয়াছিল। কিন্তু সেদিন যাহারা ও কথা শুনিয়াছিল, তাহারা পথচারী লোক। কে কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিক নাই। বছরখানেক বাঞ্ছারাম পূর্ব্বের মতই হোটেল চালাইল।

বৎসরান্তে হোটেলের নীচের সেই মুদীর স্ত্রীর সহিত বাঞ্ছারামের

স্ত্রীর একটা সামান্য কথা লইয়া তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। কলহ ক্রমে স্ত্রী মহল হইতে পুরুষ মহলে সংক্রামিত হইল। একদিন মারামারি হইয়া গেল। বাঞ্ছা পুলিসকোর্টে মুদীর নামে মোকর্দ্দমা করিল। আদালতে মুদী চাপড়ামুখী গ্রাম হইতে সাক্ষী তলব করিয়া আনাইয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে বাঞ্ছারাম ধোপা। মুদীর ৫০৲ জরিমানা হইল বটে, কিন্তু মোকর্দ্দমার বিবরণ খবরের কাগজে উঠায় বাঞ্ছারামের হোটেলগুলি খরিদ্দার অভাবে বন্ধ হইয়া গেল।

অনন্যোপায় হইয়া বাঞ্ছারাম তাহার ভাই শিবুরামকে তাড়াইয়া দিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া বর্দ্ধমানে গিয়া এক নূতন হোটেল খুলিবার বন্দোবস্ত করিল। পুরাতন ঝি চাকর প্রভৃতি সকলকে বিদায় দিয়া এবার সম্পূর্ণ নূতন লোক লইয়া হোটেল খুলিবে—পূর্ব্বকথা কেহ জানিবে না, আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না। কিন্তু সেই পুরাতন পাচক হীরুঠাকুরকে ধোপাবউ কিছুতেই বিদায় দিতে চাহিল না। বলিল—"ও গেলে অমন রাঁধুনীটি আর পাবে না। হোটেল চল্‌বে কিসের জোরে?"

স্ত্রীর একান্ত আগ্রহে বাঞ্ছারাম হীরুকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইল। বর্দ্ধমানে গিয়া হোটেল খুলিল। কিন্তু কলিকাতা সহর এক—বর্দ্ধমান আর। অতি কষ্টে সেখানে দিনপাত হইতে লাগিল।

কষ্টের দিনে, গহনাগুলির শোক ধোপাবউয়ের নূতন করিয়া উছলিয়া উঠিল। ক্রমাগত স্বামীকে সে বলিতে লাগিল, "মেয়ে নিয়ে কোথায় পালাল সে জোচ্চোর বামুন, খোঁজ কর, করে সে ছুঁড়ির কাছ থেকে আমার গহনাগুলি উদ্ধার করে আন।"

নানাস্থানে বাঞ্ছারাম অনুসন্ধান করিল কিন্তু সে 'জুয়াচোর' ব্রাহ্মণের কোনও সন্ধান পাইল না। এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়াছে।

এদিকে বাঞ্ছারাম-পুত্র রামারও বন্ধুসমাজে মুখ দেখান ভার। তাহারা সকলেই জানে ইহার বিবাহ হইয়াছিল, শ্বশুর মেয়ে লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। রামা অবশ্য ক্রমে আসল ব্যাপার সমস্তই জানিয়াছিল, কিন্তু কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই।

রামার একজন বন্ধু কাশী গিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে হঠাৎ রামা এক পত্র পাইল। বন্ধু লিখিয়াছে—"তোমার শ্বশুর মগরা নিবাসী শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কাশীতে বাস করিতেছেন। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি বাঙ্গালীটোলার নদীয়া ছত্তরে বাস করেন। আর আর বিষয় অনুসন্ধান করিয়া পরে জানাইতেছি।"

রামা অতি মনোযোগের সহিত চিঠিখানি পড়িতেছিল। এমন সময় সহসা তাহার মাতা সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার চিঠি রে রামা ?"

একটু থতমত খাইয়া রামচরণ বলিল, "ওখানা কাশী থেকে আসছে।"

"কে লিখেছে ?"

রাম বলিল, "আমার এক বন্ধু।"

"কি লিখেছে রে ?"

দ্বিধামাত্র না করিয়া রামচরণ মাতাকে চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইল।

চিঠি শুনিয়া ধোপাবউ গালে হাত দিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। পরে বলিল, "রামা! আমার একটা কথা রাখ্‌বি ?"

রাম ফিরিয়া বলিল, "কি মা ?"

রামের মা মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিল। তার পর চুপি চুপি বলিল "রামা! একটা কাজ কত্তে হবে।"

"কি মা ?"

"খবরদার ! কর্ত্তাকে যেন বলিসনে, কাউকে বলিসনে আমার মাথা খাস। কর্ত্তা শুনলে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন।"

"কি, কথাটা কি মা ?"

স্বর আরও মৃদু করিয়া রামের মা বলিল, "আমায় চুপি চুপি কাশী নিয়ে যেতে পারিস্ ? জোচ্চোর বামুন যখন সেখানে আছে, তার মেয়েও সেখানে আছে নিশ্চয়। আমার এক গা গহনা রয়েছে সেই ছুঁড়িটার গায়। দাম প্রায় হাজার দেড় হাজার টাকা হবে। কর্ত্তার যে রকম গতিক, তাতে তো ও কথা কানেই তোলেন না। হুলিয়ে কত্তে বল্লুম, থানা পুলিস কত্তে বল্লুম, সে কথা যেন কেয়ারই নেই। তা কাজ নেই বাপু ওঁকে বলে, তুই যদি আমাকে চুপি চুপি সঙ্গে করে ওই ঠিকানায় নিয়ে যেতে পারিস্, আমি দেখি একবার সে হাঘরে বামুনের কাছ থেকে গহনা আদায় কত্তে পারি কি না। তেমন মেয়েই আমি নই। আর থাকলে সে সব গহনা তো তোরই থাকবে !"

রামচরণ মাতার এই প্রস্তাবে স্তম্ভিত হইল। সে বলিল, "সে কি মা, কি বলছো তুমি ! বাবাকে না জানিয়ে তুমি চুপি চুপি কাশী যাবে, সে কি গো ! যা নয় তাই ! সে আমি পার্ব্বো না।"

রামের মা পুত্রের এ কথায় ক্রুদ্ধ হইলেন। তারপর সাবধান করিয়া দিলেন—"তবে দেখ রামা, খবরদার খবরদার। কাউকে এ কথার বিন্দুবিসর্গও বলিস্ নে। আমার মাথা খাস্।"

সে যে বলিবে না এমত আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন গেল, রাত্রিও গেল। পরদিন প্রত্যূষে বাঞ্ছারাম শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্ত্রীকে বাটীতে দেখিতে পাইল না। ক্রমে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। প্রতিবেশিগণের বাটী খুঁজিয়াও তাহাকে

পাওয়া গেল না। এমন সময়ে ঝি আসিয়া জানাইল যে কেবল গৃহিণী অদৃশ্য হইয়াছেন তাহা নহে, হোটেলের পাচক হীরু ঠাকুরও প্রভাত হইতে অদৃশ্য।

গতিক ভাল নয় দেখিয়া রামচরণ পিতার নিকট পূর্ব্বদিনের সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল এবং অন্য কাহাকেও না বলিয়া তাহার মাতা যে অবশেষে হীরু ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়াই কাশী যাত্রা করিয়াছেন তাহাই তাহার বিশ্বাস, সে কথাও বলিল।

বাঞ্ছারাম বর্ষার মেঘের মত গম্ভীর হইয়া রহিল। রামচরণ বলিল, "বাবা, আমি একবার ষ্টেশনটা খুঁজে আসি। সম্ভবতঃ রাত্রের গাড়ীতেই তাঁরা গিয়েছেন। সে গাড়ী হয়তো এতক্ষণ বাঁকীপুর কি দানাপুর পৌঁছেচে। আমি বরং মোগলসরাইয়ের ষ্টেশন মাষ্টারকে একখানা টেলি-গ্রাম করে দিয়ে আসি।"

বাঞ্ছারাম গম্ভীরভাবে বলিল, "কিছু কর্ত্তে হবে না, খবরদার কেউ কোন খোঁজ কোর না। যেখানে ইচ্ছা তারা যাক্‌গে।"

কিন্তু তাহার নিষেধ সত্ত্বেও রামচরণ বর্দ্ধমান ষ্টেশনে যাইয়া সন্ধান লইল। একজন বাঙ্গালী টিকিট কালেক্টার তাহাকে বলিলেন যে মোগল সরাইয়ে টেলিগ্রাম করিলে কোন ফলই হইবে না, কারণ ষ্টেশনের কোন কর্ম্মচারীর সাধ্যও নাই যে যাত্রীবহুল ষ্টেশনের মধ্যে একটি অনির্দ্দিষ্ট অপরিচিত স্ত্রীলোককে খুঁজিয়া বাহির করে।

হোটেলে আর লোক আসে না। হীরু ঠাকুর নাই, রাঁধিবে কে?

এক দুই করিয়া তিন দিন গেল। বাঞ্ছারাম সেই দিন অপরাহ্ণে পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, "রামা, আমি মহাপাপ করেছি, এসব তারই ফল। নিরীহ ব্রাহ্মণ পৈতে ছিড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে গেল, তার সে সব শাপ মন্নি ফলবে তো!"

বাঙ্গারামের চক্ষুপ্রান্তে কয়েক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

পিতাপুত্র উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। তারপর হঠাৎ বাঙ্গারাম বলিল, "রামা, চল কাশী যাই।"

"রামা বলিল, "কেন বাবা ?"

বাঙ্গারাম বলিল, "কেন কি রে ? তোর গর্ভধারিণী কোথায় গেল, কি অবস্থা হল তার, একটা খোঁজ নিতে হবে না ? নিশ্চয় গহনা আদায় করবার চেষ্টায় সে সেখানে গিয়েছে। প্রথমটা আমার মনে অন্যরকম নিয়েছিল ; কিন্তু এ তিনদিন অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম যে কাশীতেই তার যাওয়া সম্ভব।

সেইদিন রাত্রের ট্রেণে পিতাপুত্র উভয়ে মিলিয়া কাশীযাত্রা করিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে কাশী পৌছিয়া, বাঙ্গারাম অনেক অনুসন্ধানে নদীয়া ছত্রে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসা আবিষ্কার করিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন বাসায় ছিলেন না, একজন ঝি ছিল। বাঙ্গারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "চাটুয্যে মশায় কখন ফিরবেন ?"

ঝি বলিল, "দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যে আহ্নিক করে রাত্তির নটার সময় ফিরবেন ?"

"এ বাড়ীতে আর যারা সব রয়েছে তারা কে ? চাটুয্যে মশায়ের কেউ হয় না কি ?"

"হবে আবার কে ? সবাই ভাড়াটে। কেউ একখানা ঘর, কেউ দুইখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে, দোতলার পূব দিকের ঐ ঘরখানা চাটুয্যে মশায়ের।"

বাঙ্গারাম বলিল, "আচ্ছা ঝি, চাটুয্যে মশায়ের একটি মেয়ে ছিল না ? সেটি কোথা ?"

ঝি বলিল, "মেয়ে? কেন, সে আপন শ্বশুরবাড়ীতে আছে। রামাপুরায় তার শ্বশুরবাড়ী। তার শ্বশুর মস্ত ডাক্তার।"

এ কথা শুনিয়া বাঙ্গারাম যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "সে মেয়ের এখানে বিয়ে হয়েছে? কবে?"

ঝি বলিল, "তখন চাটুয্যে মশায় এখানে থাকতেন না, সেই ডাক্তারের বাড়ীতেই থাকতেন। এইত গেল বছর বিয়ে হল। মেয়ের বিয়ে দিয়ে তারপর চাটুয্যে মশায় এখানে এসে ঘরভাড়া নিলেন।"

বাঙ্গারাম চিত্রার্পিতের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। "যাই, আমার অনেক কাজ আছে"—বলিয়া ঝি দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছিল। বাঙ্গারাম বলিল, "কখন এলে চাটুয্যে মশায়ের সঙ্গে দেখা হবে, বল দেখি?"

"কাল এলে, কাল এস।"—বলিয়া ঝি দরজা বন্ধ করিতে উদ্যত হইল।

বাঙ্গারাম বলিল, "দাঁড়াও ঝি, দাঁড়াও।" আচ্ছা দেখ, দু তিন দিনের মধ্যে কোনও স্ত্রীলোক কি চাটুয্যে মশায়ের কাছে এসেছিল?"

ঝি বলিল, "স্ত্রীলোক? স্ত্রীলোক কেন আসবে চাটুয্যে মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে? না, না, উনি সে চরিত্রের লোক নন।"

"কেউ আসে নি?"

"কেউ না"—বলিয়া ঝি সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পুত্রসহ বিষণ্ণমনে বাঙ্গারাম সেখান হইতে চলিল। একটা যাত্রীবাড়ী খুঁজিয়া তথায় রাত্রির জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাড়ীওয়ালা পাকের উদ্যোগ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গারামের তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না। বাজার হইতে জলখাবার আনিয়া পিতাপুত্রে ভোজন করিয়া শয়ন করিল।

পিতা পুত্র কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই। অনেক রাত্রে বাঙ্গারাম বলিল, "রামা, একবার তামাক সাজ দিকিনি?"

রামা উঠিয়া তামাক সাজিতে বসিল। বাঙ্গারাম বলিল, "হ্যাঁরে, কি হল বল দিকিনি ?"

রামা নীরবে কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল।

বাঙ্গারাম বলিল, "কাল সকালেই আবার বামুনকে গিয়ে ধরছি। একবার কন্যা সম্প্রদান করে আবার মেয়ের বিয়ে দেয়! নালিশ করে তাকে জেলে না পুরলে আমার রাগ যাবে না।"

মুদীর বিরুদ্ধে কলিকাতা পুলিস কোর্টের সেই মোকদ্দমার কথা রামার স্মরণ হইল। "সে বলিল, না বাবা, নালিস ফরেদ করে আর কাজ নই। শেষে সেবারকার মত উল্টো উৎপত্তি হবে ?"

"কেন, কি আবার উৎপত্তি হবে ?"

"যদি হাকিম বলে, তোমরা, ওর নাম কি বামুন না হয়ে, জেনে শুনে বামুনের জাত মারলে কেন ? যদি তোমাকেই জেলে দেয় বাবা ?"

পুত্রের হাত হইতে হুঁকা লইয়া বাঙ্গারাম বলিল, "ইস্, জেলে দেওয়া অমনি পড়ে রয়েছে কি না !"—মুখে সে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু তামাক খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল, রামার কথাটা নিতান্ত উড়াইয়া দিবার মত নয়।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া বাঙ্গারাম নদীয়াছত্রে গেল। রামাকে সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু রামা স্বীকৃত হইল না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই মাত্র মুখ হাত ধুইয়া মাদুর পাতিয়া তামাক খাইতে বসিয়াছিলেন। বাঙ্গারামকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারেন নাই ; পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "বস, কি মনে করে হে ? বাড়ীর সব ভাল ত ?"

বাঙ্গারাম খালি মেঝের উপর বসিয়া বলিল, "এ কি শুনছি ?"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "কেন কি শুনেছ ?"

"মেয়েটির নাকি আবার বিয়ে দিয়েছেন ?"

"দিয়েছিই ত।"

"সেটা কি রকম হল ? আমার ছেলেকে কন্যা দান করেছিলেন, যথাশাস্ত্র বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—"

চট্টোপাধ্যায় বাধা দিয়া বলিলেন, "শাস্ত্রের জ্ঞান ত তোমার টন্‌টনে দেখছি হে। হিঁদুর শাস্ত্রে কি বামুনের মেয়ের সঙ্গে ধোপার ছেলের বিয়ে হয় ?"

"তবে সেটা কি হয়েছিল ?"

"হয়েছিল তোমার মুণ্ডু! আমি অমনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি ? কাশীর বড় বড় পণ্ডিতেরা আমায় পাঁতি দিয়েছেন যে, সে যা হয়েছিল তা বিবাহই নয়, হিন্দু শাস্ত্রে তা হতেই পারে না—মেয়ে আমার কুমারী, —তবে বিয়ে দিয়েছি !"

বাঞ্ছারাম নতমুখে বসিয়া রহিল। চট্টোপাধ্যায় ধুমপানান্তে কলিকাটি খুলিয়া মেঝের উপর রাখিয়া বলিলেন, "খাও।"

বাঞ্ছারাম কলিকার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্লেষযুক্ত স্বরে বলিল, "তা, দ্বিতীয় জামাইটি কেমন হল ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভালই হল। তবে, সে দ্বিতীয় পক্ষে। তা বলে বয়স বেশী নয়। এই, বছর সাতাশ আটাশ হবে। প্রথমে এসে ওদেরই বাড়ীতে আমরা থাকতাম কিনা। আমাদের সঙ্গে একটু দূর কুটুম্বিতেও আছে। সকল কথা শুনে আমার বেয়াই সেই ডাক্তারই বল্লে—সে বেশ বিদ্বান লোক—ও বিয়ে বিয়েই হয় নি, তুমি মেয়ের আবার বিয়ে দাও। সেই, যত সব বড় বড় পণ্ডিতের গাছে গিয়ে পাঁতি আনলে। তারপর, পাত্তর খুঁজতে লাগলাম, পাত্তর পাইনে। শেষে সেই ডাক্তারের ছেলে—তিন চার বছর হল তার পরিবার মারা গিয়েছিল

—বাপ মায়ের অনেক অনুরোধেও এতদিন বিয়ে করেনি—তার কি মনে হল, সে বল্লে আমি বিয়ে করব।"

বাঞ্ছারাম জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলের বাপ, এ সব জেনে শুনেও রাজি হল?"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "আমার বেয়াই? সে সাহেবী মেজাজের লোক। এ সব বিষয় সে ডোণ্টো কেয়ার করে। তা ছাড়া, পণ্ডিতেরা যখন মত দিচ্ছে, তখন ভয়টা কিসের?—তুমি তামাক খেলে না, আমি আর এক ছিলিম সাজি। স্নান করতে যাই, বেলা হল।"

"দিন আমি সাজছি।"—বলিয়া কলিকা উঠাইয়া লইয়া বাঞ্ছারাম তামাক সাজিতে বসিল। সাজিতে সাজিতে বলিল, "তা যেন হল। আচ্ছা চাটুয্যে মশায়, সে বিয়ে যদি বিয়েই নয়, তবে আমার স্ত্রীর গহনাগুলি আপনি রেখেছেন কি হক্কে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কি রকম? গয়না রেখেছি কি রকম? তোমার গয়না ত তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছি। কেন পাও নি?"

বাঞ্ছারাম চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কবে আবার ফিরিয়ে দিলেন?"

"কেন, গেল বছর আশ্বিন মাসে, রেজেষ্টি পার্শেল করে তোমার সব গহনাই ত তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে রসিদ রয়েছে। সই করে পার্শেল নিয়েছ, এখন বলছ পাইনি!"

বাঞ্ছারাম বলিল, "আমি আবার কবে সই করে পার্শেল নিলাম? কোন্ ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন?"

"কেন, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে তোমার হোটেলের ঠিকানায়! রসিদ দেখবে?"—বলিয়া ব্রাহ্মণ দেওয়ালে সংলগ্ন একটি চিঠির ফাইল পাড়িয়া তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে একখানি পীত

বর্ণের ডাক রসিদ বাহির করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে—শ্রীবাঞ্ছারাম মুখোপাধ্যায়। বকলম শ্রীমহেশ দাস ৭৫।৩ নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, ১৭ই আশ্বিন পার্শেল পাইলাম।"

জ্বলন্ত কলিকাটি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট রাখিয়া, বাঞ্ছারাম অনেকক্ষণ রসিদখানি পরীক্ষা করিয়া বলিল, "বুঝেছি। সেই মুদী শালা সই করে নিয়েছে। আমি ত আজ দু বছরের উপর কলকাতা ছাড়া।"

চট্টোপাধ্যায় ধূমপান করিতে লাগিলেন। বাঞ্ছারাম কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিল, "হায় হায় হায় রে, ধনে প্রাণে মারা গেলাম!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কলকাতায় থাক না তুমি? কোথায় আছ এখন?"

বাঞ্ছারাম উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সে অনেক কথা চাটুয্যে মশাই। এখন আসি তা হলে। প্রণাম হই।"

*   *   *   *   *

বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গিয়া বাঞ্ছারাম মনে করিল, "কলিকালেও পাপের শাস্তি আছে দেখছি। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, আর পাপ বাড়াব না!"—অবিলম্বে হোটেল তুলিয়া দিয়া, পুত্র সহ কলিকাতায় গিয়া, একটা থিয়েটারের নিকট পাণ সিগারেটের দোকান খুলিল। দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে সেই মুদীর খোঁজেও গিয়াছিল। দেখিল মুদীর ভ্রাতুষ্পুত্র দোকানে বসিয়া বিক্রয় করিতেছে। শুনিল গত বৈশাখ মাসে মুদীর গঙ্গালাভ হইয়াছে।

বাঞ্ছারামের স্ত্রীর অথবা হীরু ঠাকুরের কোনও সন্ধান আজিও পাওয়া যায় নাই।

একঘ'রে

[১]

হাটগোবিন্দপুরের জমিদার হরিহর মিত্র মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত সমাজের প্রতিনিধিবর্গ অপরাহ্ণের পূর্ব্বেই সমাগত হইয়া মধ্যাহ্নভোজনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বৃদ্ধেরা কেহ বা তামাক খাইতেছিলেন, নবাগতগণ হস্তপদধৌত করিয়া বরাদ্দমত একটী করিয়া সন্দেশ খাইয়া জলযোগের কার্য্য শেষ করিতেছিলেন।

নিমন্ত্রণপত্রে 'মধ্যাহ্নভোজন' জানিয়া জনৈক নব্যযুবক বেলা ১০টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঘড়ীতে চারিটা বাজিয়া গেল অথচ কোন আয়োজন হইল না দেখিয়া তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। সেকালের প্রথার উপর অশেষ দোষারোপ করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই গামছা কাঁধে এক ব্যক্তি আসিয়া অভ্যাগতগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "আপনারা সবাই যদি এসে থাকেন, তা হ'লে অনুগ্রহ করে গা তুলতে আজ্ঞে হোক। সকলেই এসেছেন তো?" বলিয়া সে ব্যক্তি একবার চারিদিকে চাহিয়া অবশেষে বলিল "কই বামনগাছির নটবর ঘোষ মশাইকে দেখছিনে তো!"

ভীড়ের ভিতর হইতে নটবর ঘোষ উত্তর দিলেন যে তিনি সশরীরে সেখানেই উপস্থিত আছেন।

"দুর্গাপুরের হালদার মশাই, কই তিনি কোথায় গেলেন ?"

ডাবা হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে এক বৃদ্ধ এক কোন হইতে বলিয়া উঠিলেন, "কার কথা বলছেন, আমাদের রামসর্ব্বস্বর কথা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার আজকে পেটটা ভাল নয় বলে আসতে পারে নি, তার ছেলে এসেছে।" বলিয়াই উক্ত হালদার মহাশয়ের পুত্রের উদ্দেশে বলিলেন "কই রে তারক, কোথায় গেলি, ওরে ও হনুমান !"

তারক নামধারী ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক একটী ছোকরা বৈশাখ মাসের সেই দারুণ গ্রীষ্মেও একটী সবুজ ফ্ল্যানেলের কোট গায়ে দিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিল এবং বয়োঃজ্যেষ্ঠগণকে গোপন করিয়া একটী থামের আড়ালে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। বৃদ্ধের এই অভিনব সম্বোধনে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে তাড়াতাড়ি হুঁকাটি হস্তান্তরিত করিয়া বলিল "এই যে আমি এখানে রয়েছি ঘোষ জ্যাঠামশাই।"

ঘোষজ্যাঠা বলিলেন "কথা কচ্ছিস না কেন রে বাঁদর কোথাকার ! এঁরা যে তোর বাপ আসেনি কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, বল না।"

তারক তখন প্রশ্নকর্ত্তাকে জানাইল যে যথার্থই সহসা উদরাময়ে আক্রান্ত হইয়া তাহার পিতা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং সেজন্য তিনি যথেষ্ট দুঃখিত হইয়াছেন।

যিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "তা হ'লে আর বিলম্ব না করে সব গা তুলতে আজ্ঞা হোক। পাতা হয়েছে ওদিকে।"

"ওঠ হে মজুমদার", "উঠছি এই টানটা টেনে" "মধুখুড়ো কই", "এই যে উঠানে", "এসো" ইত্যাদি রবে নিমন্ত্রিতবর্গ গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরস্থ উঠানে 'পাতে'র নিকট যাইয়া এক একখানি ছেঁড়া কলা-পাতা লইয়া বসিলেন। বালকেরা তাহাদের জন্য যে জলের গেলাস

দেওয়া হইয়াছিল তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিল, উদ্দেশ্য—বাটীতে মিষ্টান্ন লইয়া যাইবে।

কর্ম্মকর্ত্তা হরিহর বাবু মুণ্ডিত মস্তকে স্বয়ং সেখানে তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন "নারাণ! সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন ত?"

নারাণ নামীয় শীর্ণকায় একটা যুবক মাটীর গেলাসে জল দিতে ব্যস্ত ছিল, সে বলিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারে সবাই এসেছেন।"

দীর্ঘশ্মশ্রুপরিবৃত এক বহু প্রাচীন ব্যক্তি চারিদিক চাহিয়া বলিলেন "কই, রামদুলালদের কেউ আসেনি তো?"

হরিহর বাবু যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন, তার পর বলিলেন "তার কথা আর বলবেন না মজুমদার মশাই।"

"কেন?"

এমন সময় সমবেত জনসঙ্ঘের সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। নিকটেই উপবিষ্ট এক ব্যক্তি আর একটী মাটীর গেলাস চাহিয়া বলিলেন "কোন রামদুলাল, আমাদের রামতারণ বোসের ছেলে?"

হরিহর মিত্র বলিলেন "আজ্ঞে তার ছেলে নয়, ভাইপো।"

"ওই হোল, কেন তিনি আসেন নি কেন? তা হলে তো আমাদের বসাটা উচিতই হয় নি, বুঝেছো হে নিবারণ, একজন এখনও আসেন নি।"

নিবারণ ওরফে পাল মহাশয় পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিত হইয়া অনতি-দূরেই বসিয়াছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়াই বলিলেন "তাই তো, তা হলে আমাদের বসা ভাল হয় নি তো। লোক পাঠান, লোক পাঠান তাঁকে ডাকতে।"

হরিহর বাবু বলিলেন "আজ্ঞে আর ডাকতে হবে না, আপনারা বসুন, সে আসবে না।"

"কেন, আসবে না কেন?" "কে আসবে না?" ইত্যাদি রব দুই এক জনের মুখ হইতে ধ্বনিত হইল।

হরিহর বাবু বলিলেন "রামদুলাল বোস কিছুতেই আসবে না, আপনারা নিশ্চিন্ত হোন, তাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নি।"

"কেন?" অকস্মাৎ এই কথা প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিলেন। ছেলেরা ইত্যবসরে তাহাদের প্রথম লুক্কায়িত গেলাসের পরিবর্ত্তে যে দ্বিতীয় গেলাস পাইয়াছিল, সেটীও পশ্চাতে লুকাইয়া তৃতীয় গেলাসের দাবী করিল।

হরিহর বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "তাকে একঘ'রে করা হয়েছে।"

"একঘ'রে!" শুনুন মশাইরা, শোন গো বাবুরা, কাকে আবার সমাজ থেকে একঘ'রে করা হোল। শোন সব, সমাজে তার হুঁকো, ধোপা, নাপিত, সব বন্ধ।

একটু কাশিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে হরিহর বাবু বলিতে লাগিলেন "শুনুন সকলে, সকলেই তো এখানে রয়েছেন, ওই মজুমদার মশাই, ঘোষ মশাই, মিত্তিরজা প্রভৃতি সবাই তো রয়েছেন, ওই যে পাল মশাইও তো আছেন, আচ্ছা, আপনারা তো সমাজের মাথা, আপনারাই কেন এর বিচার করুন না!"

মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের মুহুরী পাল মহাশয় সমাজের মস্তক-স্বরূপ, এ মন্তব্যে তিনি গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, একটু কুঁজো হইয়া বসিয়াছিলেন, এক্ষণে মস্তক উত্তোলন করিয়া আত্মঘোষণা করিতে লাগিলেন।

হরিহর বাবু বলিতে লাগিলেন "আচ্ছা, যে লোক স্বেচ্ছাচারী, উচ্চ নীচ মানে না, সামান্য ব্যাপার নিয়ে লোকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে বেড়ায়, মার ধোর করে লোকের মাথা ফাটিয়ে দেয়, এই গ্রামের মধ্যে বাস করে অথচ আমাকে মানে না, এমন লোককে সমাজে রাখা উচিত কি? বলুন, আপনারাই বলুন, আমি তো দীনাতিদীন, আমি কিছুই বলবো না, বলি এমন লোককে সমাজে রাখা উচিত?"

সর্ব্বাগ্রে পাল মহাশয়ই বলিয়া উঠিলেন "কখনই না, সে কি কথা।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "সমাজ তো তা'হলে দুদিনে উচ্ছন্ন যাবে, হিন্দুধর্ম্ম কি আর থাকবে মনে করেছেন? সুধু তাই নয়, আবার যা করেন তিনি, তাই বলে আর এই খাওয়ার সময় আপনাদের মনে একটা ঘৃণা আনতে চাই নে। এখন বলুন, এ সব লোককে সমাজে রাখা মঙ্গল না অমঙ্গল। আমি এই রামদুলাল বোসের কথা বলছি।"

সমাগত জনমণ্ডলী নীরব রহিল, কেহই কোন কথা কহিল না।

হরিহর বাবু আবার বলিতে লাগিলেন "এ রকম লোককে সমাজে রাখতে আপনারা মত দেন, আমি ঘাড় হেঁট করে তাকে ডেকে নিয়ে আসছি। বলুন না দে মশাই, আপনিও তো সমাজের মধ্যে একজন প্রাচীন লোক।"

দে মহাশয় ওরফে যদুনাথ দে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি হরিহর মিত্রের নিকট হইতে নিজ কন্যার বিবাহোপলক্ষে ৫০৲ টাকা সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "যাঁরা ওঁকে নিয়ে খেতে ইচ্ছে করেন, তাঁরা খান; আমরা এমন লোক নিয়ে সমাজে থেকে নিজেদের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারবো না।"

সমবেত বৃদ্ধমণ্ডলী হইতে প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিলেন "না না, আমাদেরও কাজ নেই। যে রকম শুনছি সে রকম লোক যদি সে হয়,

তা হলে আমরা ধর্ম্মে পতিত হবো বৈ কি। বুড়ো বয়সে শেষটা কি ধর্ম্ম খোয়াব? বাপরে!"

হরিহর বাবু বলিলেন "তা হলে আজ সমবেত সমাজমণ্ডলী থেকে সাব্যস্ত হোল যে রামযাদু বোসের ছেলে রামদুলাল বোস আজ থেকে আমাদের সমাজে একঘ'রে হলেন। আমাদের এ সমাজে তাঁর হুঁকো, ধোপা, নাপিত, ছেলে-মেয়ের বিয়ে সমস্ত বন্ধ।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই, সেই ব্যবস্থাই বই কি?" পাল ও দে মহাশয়দ্বয় দুই দিক হইতে যুগপৎ বলিয়া উঠিলেন।

এইরূপে সমাজ হইতে রামদুলাল একঘ'রে হইল।

[২]

সন্ধ্যার সময় রামদুলাল নিজগৃহে আসিয়া স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "লক্ষ্মী! সমাজে আমাকে একঘ'রে করেছে।"

লক্ষ্মী তখন উঠানে অবস্থিত তুলসীতলায় সন্ধ্যা জ্বালিতেছিল। সন্ধ্যা জ্বালিয়া, তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কেন, কি হয়েছে, একঘ'রে কল্লে কেন?"

"অদৃষ্টের দোষ" বলিয়াই রামদুলাল বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মী বলিল "কাঁদচ কেন? কল্লেই বা একঘ'রে, আমাদের বাড়ী না হয় সমাজ খাবে না। কবেই বা আমরা দোল-দেল দুর্গোৎসব করে সমাজ নেমন্তন্ন কর্চ্ছি যে সমাজ আমাদের বাড়ী খাবে না! না খাকৃগে!"

"বুঝতে পাচ্ছ না লক্ষ্মী, যদি দোল দেল দুর্গোৎসব করবার মত অবস্থা হোত, তা হলে এক ঘরে হতে হোত না। তোমার আমার জন্যে

তো আর ভাবছি না, ভাবছি মেয়েটার জন্যে। তের চোদ্দ বছরের মেয়ে হোল, তার বিয়ে দিতে পারবো না।"

লক্ষ্মী ক্রমশই বিস্ময়াপন্ন হইতেছিল। সে বলিল "কেন, মেয়ের বিয়ে কি সমাজের সঙ্গে হতে যাচ্ছে নাকি!"

"আহাঃ, সমাজের কেউ আসবে না, কেউ আমার বাড়ী খাবে না, আর যে আমার মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দেবে সে যদি শোনে যে আমি একঘ'রে, তা হ'লে কথনই বিয়ে দেবে না।"

লক্ষ্মী দ্বারের চৌকাঠে গঙ্গাজল ছিটাইয়া তিনবার শঙ্খধ্বনি করিল। ঘরে ধূনা দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে রামদুলাল পূর্ব্ববৎ বসিয়া আছে, তাহার দৃষ্টি উদাস। সে তাহা দেখিয়া বলিল, "নাও, সন্ধ্যে বেলা অমন করে বসে থাকতে নেই, মেয়ের কপালে থাকে ও রাজরাণী হবে, তাতে সমাজ আমাদের একঘ'রেই করুক আর যাই করুক। সবই মেয়ের বরাত।

* * * *

বি-এ পরীক্ষায় উপর্য্যুপরি দুইবার ফেল হইয়া রামদুলাল বসু যখন চাকরির চেষ্টায় সংবাদ পত্রের নিয়মিত বিজ্ঞাপন পাঠক হইলেন, তখন তাঁহার পিতৃব্যের সহসা কাল হইল। নিঃসন্তান পিতৃব্যের যাহা কিছু সঙ্গতি ছিল তাহাতে পল্লীগ্রামে একটি গৃহস্থের মোটা ভাতকাপড় স্বচ্ছন্দেই চলিয়া যাইত, সুতরাং চাকরিরূপ অমূল্য জিনিষের আশা ও লোভ তখন পরিত্যাগ করিয়া রামদুলাল সহর ছাড়িয়া জন্মভূমিতেই বাস করিতে লাগিল। আয়ের আর একটি উপায়ও জুটিল, গ্রামের জমীদার পূর্ব্বোক্ত হরিহর মিত্রের পুত্র শরতের গ্রীষ্মাবকাশ হইলে সে যখন বাড়ী আসিত, তখন রামদুলাল মাসিক পনের টাকা বেতনে তাহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইত। এইরূপে দিনগুলি কাটিত।

কিন্তু অলখনিরঞ্জন অলক্ষ্যে থাকিয়া এই দুইটি পরিবারের মধ্যে এমন একটা চক্রের সৃষ্টি করিলেন যাহাতে সব ওলট পালট হইয়া গেল। জমীদার হরিহর মিত্র যখন দেখিলেন সে শিক্ষিত রামদুলাল নিরক্ষর কৃষককৃষকে খাজনার আইন বুঝাইয়া দেয়, জমীদার প্রজার কাছে কি কি ন্যায়সঙ্গত দাবী করিতে পারেন না পারেন তাহারই শিক্ষা দেয়, তখনই তিনি প্রকাশ্যে সন্তোষের ভাণ করিলেও আন্তরিক এই লোকটার উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

কিন্তু ধূমায়িত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার আর একটা সুযোগ ঘটিল। সামান্য একটা কলাবাগান লইয়া উভয়ের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকুটি, তারপর মামলা মোকর্দ্দমা, এমন কি শেষ আপীল হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। ধনী জমীদারের সহিত মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ সমান অর্থব্যয় করিতে পারিল না, তাহার ফলে কেবল যে কলাবাগানটী রামদুলালের হস্তচ্যুত হইল তাহা নহে, সে সমাজচ্যুতও হইল। সে কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।

* * * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে গ্রামের রজক আসিয়া রামদুলালের সমস্ত কাপড়গুলি ফিরাইয়া দিয়া বিনীতভাবে তাহাকে জানাইল যে সে আর তাহার কাপড় কাচিতে অক্ষম।

রজক চলিয়া গেলে রামদুলাল স্ত্রীকে বলিল, "দেখতে পাচ্ছ, আগুন ক্রমেই জ্বলে উঠছে।"

লক্ষ্মী উঠান হইতে কাপড়গুলি তুলিয়া বারাণ্ডার এককোণে রাখিয়া বলিল, "ওতে আর কি হয়েছে, আমি কাল সাবান দিয়ে সব কাপড় কেচে দোবো।"

"আহা, তা ত দেবে, কিন্তু ব্যাপারখানা তো বুঝছো।"

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। তারপর লক্ষ্মী বলিল, "তুমি কিছু ভেব না, ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করে লাভ কি, তুমি বরং কাল গাজিরগাঁয় যাও, সেখানে তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা তো একরকম ঠিক হয়েই আছে, সেইখানেই যাতে শীগ্‌গীর কাজটা হয়ে যায় তাই বলে এসো।"

স্ত্রীর পরামর্শমত প্রত্যূষেই রামদুলাল পাঁচক্রোশ পথ হাঁটিয়া গাজির-গ্রামে উপস্থিত হইল। ভাবী বৈবাহিক যথেষ্ট মিষ্টালাপে তুষ্ট করিয়া তাহাকে অতি বিনীতভাবে জানাইলেন যে গতকল্য কয়েকজন গ্রামস্থ ব্যক্তির মুখে তাহার সমাজচ্যুত হওয়ার সংবাদ তিনি পাইয়াছেন, সুতরাং কন্যাটি মনোনীত হইলেও সেখানে নিজপুত্রের বিবাহ দিতে তিনি আপাততঃ অক্ষম।

দ্বিপ্রহর রৌদ্রে বাড়ী ফিরিয়া রামদুলাল স্ত্রীকে সকল কথা বলিল। লক্ষ্মী বলিল, "তা, এক কাজ কর, কলিকাতায় আমার দিদির বাড়ী চল, সেখানে ত আর কেউ সমাজ মানে না।"

শুষ্কমুখে রামদুলাল বলিল, "কে বল্লে যে সেখানে কেউ সমাজ মানে না।"

"তবু সেখানে গেলে একটা হিল্লে হবেই:হবে তা বলে দিচ্ছি।"

রামদুলাল কোন উত্তর দিল না। একটা দারুন দুশ্চিন্তার গুরুভার তাহার শরীরকে তখন অবসন্ন করিতেছিল।

[৩]

এই ঘটনার প্রায় পনের দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় গোলদিঘীর একটি বেঞ্চে বসিয়া রামদুলাল আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। এক

সপ্তাহ হইল সে সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু কন্যার বিবাহের কোন যোগাড়ই করিয়া উঠিতে পারে নাই।"

অপর পারে একজন ইংরাজ ধর্ম্মপ্রচারক একখানি বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন, অল্পক্ষণ মধ্যেই সেখানে লোকারণ্য হইয়া গেল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য রামদুলালও উঠিল। এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "রামদুলাল বাবু না!"

পিছন ফিরিয়া রামদুলাল চাহিয়া দেখিল যে পাঞ্জাবী গায়ে দুইটী যুবক। উভয়েরই চক্ষে সবুজ চশমা। সে মুহূর্ত্তের মধ্যে চিনিল যে আহ্বানকারী তাহারই জনৈক সহপাঠীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাহার নাম সত্যপ্রিয় দত্ত।

"এ কি এ, রামদুলাল বাবু আপনি হঠাৎ এখানে, কবে এলেন, কই কোন খবরই ত আমরা পাই নি। কোথায় এসেছেন?"

রামদুলাল বলিল, "সত্যপ্রিয়! ছুটিতে তুমি এবার দেশে যাওনি? তোমার দাদা কোথায়?"

"দাদা ত প্রায় বছরখানেক হোল কটকে প্র্যাক্‌টিস্ কচ্ছেন। আমি এখানে মেসে থাকি। আমার একজামিন হচ্ছে কি না, তাই এখনও দেশে যাইনি, কাল পলিটিক্স হয়ে গেল, আজ কাল ছুটি, আবার পরশু দিন হিষ্ট্রী হয়ে তবে শেষ হবে। আসুন না বসি।"

রামদুলাল বলিল, "ওই ওপারে কিসের ভিড় হয়েছে দেখতে যাচ্ছিলাম।

"আরে রাধেমাধব! ওর কি দেখবেন? পাদ্রি সাহেব লেক্‌চার দিচ্ছে। বসুন এইখানে।"

একখানি বেঞ্চে একজন মাত্র বসিয়াছিল, তিনজন তাহাতে গিয়া বসিবামাত্র সে ব্যক্তি উঠিয়া গেল। রামদুলালের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া

সত্যপ্রিয় বলিল, "আর রামদুলাল বাবু! আমাদের একেবারে ভুলেই গেছেন, আসেনই না আর কোলকাতায়, দাদা প্রায়ই বলেন যে আপনি একখানা চিঠি দিয়েও আর তাঁর খোঁজটা নেন না।"

রামদুলাল একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সত্যপ্রিয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সে শৈশব হইতে বি-এ, ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। উভয়ের মধ্যে যে প্রীতি ছিল তাহা অনেক সহোদরের মধ্যেও বিরল।

রামদুলাল বলিল "সত্য! আমি বড় দায়ে পড়েই কলকাতায় এসেছি।"

"কি রকম?"

কিছুমাত্র গোপন না করিয়া রামদুলাল নিজের কাহিনী সত্যপ্রিয়কে আগাগোড়া বলিল। সত্যপ্রিয় বলিল "বলেন কি, এই একটা তুচ্ছ কারণে আপনার মেয়ের বিয়ে হবে না?"

বিরসবদনে রামদুলাল বলিল, "তুমি সহুরে ছেলে, তাই বলছো তুচ্ছ কারণ, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে সমাজচ্যুত হওয়াটা বড় ভীষণ রকমের।"

সত্যপ্রিয় বলিল, "বেশ, আপনি বাজি রাখুন, আমি বলছি আপনার মেয়ের বিয়ে আমি দেওয়াবই দেওয়াব।"

রামদুলাল কোন উত্তর দিল না, ঈষৎ হাসিল মাত্র। তারপর বলিল, "যতটা সোজা মনে কচ্ছ, ততটা সোজা নয়। এ একটা ছেলে খেলা নয় যে বাজি রেখে হারজিৎ খেলবে। যাক সন্ধ্যে হয়ে এলো, তুমি আর দেরী করো না, আবার পরশু দিন একজামিন।"

"কিন্তু আমি যা বল্লুম, তা আপনি দেখে নেবেন, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ কচ্ছি যে যেমন করে পারি আপনার মেয়ের বিয়ে দেওয়াবই দেওয়াব। এত বড় একটা সমাজিক অত্যাচারের প্রতিবিধান করা খুবই দরকার।"

রামদুলাল আবার হাসিল। তারপর সত্যপ্রিয়ের মেসের ঠিকানা জানিয়া লইয়া, নিজের ঠিকানা তাহাকে বলিয়া উভয়ে স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে গেল।

[৪]

বৈশাখমাস। মেসের অধিকাংশ ছাত্রমণ্ডলী নিজ নিজ পরীক্ষান্তে দেশে গিয়াছে, কাজেই যে কয়জন ছিল তাহাদের মধ্যে ২।১ জন ব্যতীত আর সকলেই সহপাঠী।

রাত্রে আহারে বসিয়া যখন সকলে ইতিহাসের পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল, তখন সত্যপ্রিয় তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিল— "আচ্ছা ভাই, হিষ্ট্রীর কথা রেখে এখন আমার কথা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোন।" বলিয়া সন্ধ্যার সময় গোলদিঘীতে রামদুলাল প্রমুখাৎ যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সমস্ত বর্ণনা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমরাই সকলে বল, যে এ রকম করে অন্যায়ভাবে যে সমাজচ্যুত হয়েছে, তার মেয়ের বিয়ে হবে না?"

সমস্বরে সকলেই বলিল "কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে।"

সত্যপ্রিয় বলিল, "তবে এক কাজ করতে হবে। এতকাল নাটক নভেল আর স্কুল কলেজের বই পড়ে কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই আয়ত্ত করা হয়েছে, এইবার কিন্তু আসল কাজে হাত দিতে হবে। আমাদেরই মধ্যে যার সঙ্গে হোক, সেই মেয়েটীর বিয়ে দিতে হবে। যাদব, তিনকড়ি, নবীন আর শ্যামাচরণ, এই যে কজন ব্রাহ্মণ ও অন্যজাত আছে এরা ছাড়া বাকী যে কেউ বিবাহ কর্ত্তে ইচ্ছুক হও বল।"

কেহ কথা কহিল না। দুই একজন হাসিয়া উঠিল।

সত্যপ্রিয় তখন বলিল, "আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। লটারি করা

যাক্ এসো। খেয়ে দেয়ে এসো লটারি হোক, যার নামে উঠবে তাকেই কিন্তু বিয়ে কর্ত্তে হবে।"

সুরেন্দ্র নামা পূর্ব্ববঙ্গবাসী একজন ছাত্র নীরবে বসিয়া আহার করিতেছিল। সে সত্যপ্রিয়কে জানাইল যে এরূপ হুজুগে যোগদান করিতে সে অসমর্থ, সুতরাং তাহার নাম যেন লটারিতে না ধরা হয়।

রাজীবলোচন নামা আর একটি কায়স্থ সন্তানও এই কথা বলিল। সত্যপ্রিয় উভয়েরই নাম বাদ দিয়া লটারি করিবে আশ্বাস দিল।

আহার ইতিমধ্যে সমাপ্ত হইয়া আসিল। আহারান্তে সকলে উপরে উঠিলে সত্যপ্রিয় বলিল "তা হলে এইবার লটারি আরম্ভ করা যাক।"

২।১ জন পরীক্ষার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে এবং পরীক্ষার পর এ সকল ব্যাপার হইলে চলিবে বলিয়া আপত্তি করিলেও সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পাচক ঠাকুরের নিকট হইতে দুইটী হাঁড়ি চাহিয়া লইল এবং একখণ্ড কাগজকে কাটিয়া দশখণ্ড করিয়া পাঁচখানিতে পাঁচজনের নাম এবং চারিখানিতে শূন্য এবং একখানিতে লাল পেন্সিল দিয়া বড় বড় অক্ষরে "বিবাহ করিতে হইবে" এই কথা লিখিয়া—সমস্ত কাগজগুলি উত্তমরূপে পাকাইয়া হাঁড়ি দুইটিতে রাখিল। স্থির হইয়া পাচক ঠাকুর এবং মেসের ভৃত্য এক একটি করিয়া হাঁড়ি হইতে পর্য্যায়-ক্রমে কাগজ তুলিবে।

'মহেন্দ্র', 'জগদীশ', 'ভবতারণ', এই তিনজন শূন্য হইয়া গেলে চতুর্থবারে যে কাগজ উঠিল তাহা দেখিয়া একজন বলিয়া উঠিলেন "এই-বার যার উঠ্‌বে, তারই 'বিবাহ করিতে হইবে।' বাকী ছিল সত্য-প্রিয় স্বয়ং ও রাধানাথ নামক একটি ছাত্র, উভয়েরই বুকের ভিতর তখন ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

নামের কাগজ উঠিলে সকলে উৎসুক চিত্তে উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে তাহাতে লেখা আছে "রাধানাথ রায়।"

একটা অব্যক্ত চীৎকার ধ্বনিতে মেসের কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। গম্ভীর ভাবে যাহারা পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহারাও পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া আসিয়া রাধানাথের পিঠ চাপড়াইয়া দুই একটি রসিকতা করিবার সুযোগ ছাড়িতে পারিল না।

রাধানাথ বেশ অবস্থাপন্ন লোকের পুত্র। খুলনা জেলায় ভাঙ্গনহাটী গ্রামে তাহাদের বাস। তাহার পিতা ভাঙ্গনহাটী ও তৎচতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের জমীদার এবং খুলনায় ওকালতী করিয়া থাকেন। রাধানাথই পিতার একমাত্র সন্তান।

সত্যপ্রিয় তাহাকে বলিল, "তোর বাপ মার এতে মত হবে তো? আমরা কিন্তু গোপনে কোন কাজ করবো না। তোর বাপ মাকে পরিষ্কার বলতে হবে যে দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়ে, প্রবলের অত্যাচারে পড়েই মেয়েটীর বাপ একঘ'রে হয়েছে।

রাধানাথ জানাইল যে কন্যাটী যদি একেবারে কুৎসিত না হয়—তাহা হইলে তাহারও কোন অমত নাই, বরং সম্পূর্ণ মতই আছে—এবং তাহার মত হইলে তাহার পিতামাতাও অমত করিবেন না।

* * * * *

পরদিনই সত্যপ্রিয়র সহিত রামদুলালের বাসায় যাইয়া পাত্রের বন্ধু পরিচয়ে রাধানাথ কন্যা দেখিল। অপছন্দের কোন কারণই ছিল না; সুতরাং সে বিবাহে সম্মতি জানাইল। আনন্দে রামদুলালের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল।

সত্যপ্রিয় তাহাকে বলিল, "কাল আমাদের একজামিনটা হয়ে গেলেই

পরশু দিন সকালেই আমি ভাঙ্গনহাটী গিয়ে রাধানাথের বাপের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইবো। আপনি দেশে যান, আপনার মেয়ের বিয়ের জন্যে আর ভাবতে হবে না।"

রামদুলাল বলিল, "কি বলে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবো বলতে পারি না, আমি গরীব, দুর্দ্দশাপন্ন, কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনিই তোমাদের পুরস্কার দেবেন। যাই হোক, একজামিনের পড়াশুনার ব্যাঘাত করে এ সকল কাজ করবার কোন দরকার নেই, আর পাত্রের বাপকে যেন বিশেষ করে বলা হয় যে আমি একঘ'রে। আমি লুকিয়ে কোন কাজ করতে চাই নে।"

সেই দিনই রাত্রের ট্রেণে স্ত্রী ও কন্যাসহ রামদুলাল দেশে রওনা হইল।

[৫]

ছয়দিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত অতিবাহিত হইবার পর রামদুলাল এক খামের পত্র পাইল। সাগ্রহে তাহা পড়িয়া দেখিল যে সত্যপ্রিয় লিখিয়াছে, এ বিবাহে রাধানাথের পিতার সম্পূর্ণ মত আছে, এবং তিনি এরূপে একজন নিরীহ ভদ্রলোকের উপকার করিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। সুতরাং আগামী বুধবার প্রাতের ট্রেণে কয়েকটী বন্ধুবান্ধব সহ সত্যপ্রিয় আসিয়া কন্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবে।

আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া পত্রখানি হাতে করিয়া রামদুলাল বাড়ী আসিয়া বলিল, "লক্ষ্মী, ঈশ্বর দিন দিয়েছেন।"

আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া লক্ষ্মী বলিল, "দেখলে, আমি তো বলেছিলাম, যে যদি মেয়ের কপালে থাকে তবে ও রাজরাণী হবে।"

"ঠিক কথা। এখন তাদের আদর অভ্যর্থনা যাতে কর্ত্তে পারি, তার ব্যবস্থা এই ক'দিনে করে রাখতে হবে।"

লক্ষ্মী বলিল, "আজ হল রবিবার, এখনো তিন দিন দেরী আছে, তার মধ্যে খুব ব্যবস্থা আমি করে রাখবো'খন। তুমি বরং তাদের আসবার জন্যে গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করগে।"

* * * * *

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সপারিষদ হরিহর মিত্র শুনিলেন যে কোথাকার এক জমীদার পুত্রের সহিত 'একঘ'রে' রামদুলালের কন্যার বিবাহের যোগাড় হইতেছে এবং ষ্টেশন হইতে তাহাদের আসিবার জন্য রামদুলাল গোযান সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া হরিহর জনৈক পার্শ্বচরকে বলিলেন, "নারাণ, সমস্ত গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের বলে এসো যে কেউ রামদুলালের ভাড়ায় যাবে তার একেবারে মুণ্ডুপাত করবো। দেখি, ও কেমন করে আমার ওপর টেকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেয়।"

নারান নামীয় পার্শ্বচর কর্ত্তৃক অবিলম্বে সে আজ্ঞা প্রচারিত হইল।

* * * * *

ষ্টেশন হইতে হাটগোবিন্দপুর প্রায় পাঁচ ক্রোশ। বহু চেষ্টা ও অন্বেষণ করিয়াও রামদুলাল যখন একখানিও গোযান সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন সে প্রমাদ গণিল। ভদ্রসন্তানকে, বিশেষতঃ ভাবী কুটুম্বকে কিছু আর পাঁচ ক্রোশ পল্লীপথ হাঁটাইয়া আনা যায় না, এবং অন্য যানও যখন নাই, তখন কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিতে তাহাকে একটু বিচলিত হইতে হইল।

অনন্যোপায় হইয়া সে ষ্টেশনে যাইয়া সত্যপ্রিয়র নামে একখানি প্রিপেড টেলিগ্রাম করিয়া, গাড়ী বন্ধ করার চক্রান্ত জানাইয়া, উত্তরের অপেক্ষায় ষ্টেশনে বসিয়া রহিল। ৩।৪ ঘণ্টা পরেই টেলিগ্রামের উত্তরে সত্যপ্রিয় জানাইল যে গোযানের জন্য ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহারা যে কয়জন যাইবে সকলেই স্ব স্ব বাইসিকেল লইয়া আসিবে।

হর্ষোৎফুল্ল রামদুলাল বাটী আসিয়া স্ত্রীকে সমস্ত বলিয়া এ কথা গোপন রাখিবার অনুরোধ করিল।

[৬]

নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলেই আসিলেন। বন্ধুবর্গের মধ্যে ২।১ জন ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় কন্যা দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার দেখিলেন। রাধানাথের খুল্লতাত সম্পর্কীয় এক ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তিনি কন্যার দুই হস্তে দুইখানি গিনি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ভোজনান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। রামদুলাল দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে আসিলে, সত্যপ্রিয় জনান্তিকে তাঁহাকে একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। রামদুলাল ফিরিলা গেল।

বন্ধু চতুষ্টয় ও রাধানাথের সম্পর্কীয় খুল্লতাত সেখান হইতে বরাবর যাইয়া হরিহর মিত্রের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

আহারাদি সমাপন করিয়া হরিহর সবেমাত্র শয্যায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, এমন সময় আগন্তুক পাঁচজনকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া শ্লথবসন সংযত করিয়া বলিলেন, "আসুন, আসুন, আসতে

আজ্ঞা হোক, বসুন। উঃ কি গরমই পড়েছে। অসহ্য গরম! তামাক আনতে বলবো।"

বন্ধুবর্গের মধ্যে ভবতারন নামধারী একজন অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে জানাইল যে তাঁহারা কেহই তামাক খান না।

অল্পকাল নীরব থাকিয়া, একবার হাই তুলিয়া হরিহর বলিলেন, "মেয়ে দেখা হোল? কেমন মেয়ে দেখলেন?" বলিয়া পানপূর্ণ একটী ডিবা অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ডিবা হইতে একটী পান তুলিয়া লইয়া সত্যপ্রিয় বলিল "তা মন্দ কি? গেরস্ত ঘরের পক্ষে মেয়েটী নেহাৎ কুৎসিৎ না হলেই হোল। আমরা ত আর আলমারীতে সাজিয়ে রাখতে যাচ্ছি না, তা যা দেখলাম, তাতে তো মন্দ বলে বোধ হোল না, বেশ ভালই বোধ হোল। কি বল হে সত্যেন।"

সত্যেন্দ্র বলিল "হ্যাঁ, তা বৈ কি। মন্দ কি আর মেয়ে, বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে।"

মুখখানি একটু গম্ভীর করিয়া হরিহর জিজ্ঞাসা করিলেন "ছেলেটী কি করেন?"

সত্যপ্রিয় রাধানাথের সাংসারিক অবস্থা এবং তাহার পড়াশুনার পরিচয় দিল।

হরিহর মিত্রের মুখখানি আরও গম্ভীর হইল। একটী পান মুখে দিয়া তিনি বলিলেন, "বটে, তা দেনা পাওনার কথা কি রকম হোল?"

রাধানাথের খুল্লতাত বলিলেন, "দেখুন, পরের পয়সা নিয়ে কে কবে আর বড়মানুষ হয়েছে বলুন, আমরা বলেছিলাম যে মেয়েটী যদি ভাল হয়, তা হলে দেনাপাওনার জন্যে আটকাবে না। তা, মেয়েটী যখন অপছন্দ নয়, তখন গৃহস্থ লোককে আর কি পীড়াপীড়ি করবো,

আমরা এক পয়সাও নেব না বলেছি, ওঁর মেয়ে উনি যেন শাঁখা সিঁদুর দিয়ে উৎসর্গ করেন।"

হরিহর কেবলমাত্র বলিলেন "হুঁ।"

বন্ধুবর্গ পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হরিহর আবার বলিলেন, "সব তো হোল, কিন্তু এ দিকে ভেতরের কথা কিছু শুনেছেন ?"

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবার ভাণ করিয়া সত্যপ্রিয় বলিল, "আজ্ঞে না, কেন বলুন দেখি, ভেতরে কি কিছু গোলোযোগ আছে না কি ?"

একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া হরিহর বলিলেন "খুব।"

"কি রকম ?"

"রামদুলাল বোসকে এখানকার সমাজ থেকে একঘ'রে করেছে। সমাজে ওঁর হুঁকো, ধোপা, নাপিত, সব বন্ধ। আমরা তো ওর সঙ্গে কেউ কথাই কই নে, এমন কি এক রাস্তা দিয়েও হাঁটিনে।"

একটু বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হইবার ভাণ করিয়া সত্যপ্রিয় বলিল "অ্যাঁ, বলেন কি ? একঘ'রে ? না না !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ একঘ'রে। যাকে ইচ্ছা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

"জিজ্ঞাসা আর কি করবো মশাই, একঘ'রে তা তো আমরা জানতাম না। তা হলে কি আর এ কাজে হাত দিতাম ! এখন উপায় ? শুনলে তো হে ভবতারণ।"

শুষ্কমুখে ভবতারণ বলিল, "তাই তো, এ যে বড় মুস্কিলের ব্যাপার।"

সত্যপ্রিয় বলিল, "দেখুন, আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আগেই হয়ে গিয়েছিল, তবে অনেকটা দূর বলেই আমরা এতদিন আসতে পারিনি।

আমাদের নিজেদের বন্দোবস্ত সব ঠিক ঠাক করে, এমন কি এই মঙ্গলবারে বিয়ে হবে বলে চিঠি পর্য্যন্ত ছাপিয়ে, তার পর আজ এসেছিলাম আশীর্ব্বাদ কত্তে।"

মৃদু হাস্যের সহিত হরিহর বলিলেন "কি রকম! মেয়ে না দেখেই নেমন্তন্ন পত্র ছাপা'লেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মেয়ে দেখেছিলাম বৈ কি, কলিকাতায় মেয়ে দেখা হয়েছিল, সেইখানথেকেই কথাবার্ত্তা, দিনস্থির, সমস্তই হয়েছিল, আশীর্ব্বাদটা কেবল একটা শাস্ত্রীয় প্রথা বৈত নয়, সেইটে আজ এসে সেরে যাচ্ছি। কিন্তু কে জানে মশাই, যে এর ভেতরে এত কাণ্ড আছে। আগে যদি এ কথার বাষ্পও টের পেতাম, আহা হা, এখন উপায়? এ কথা যদি প্রকাশ পায় তাহলে যে একেবারে দাঁড়িয়ে হাস্যাস্পদ হতে হবে।"

হরিহর আবার ঘাড় দোলাইয়া বলিলেন "প্রকাশ নিশ্চয়ই পাবে। এ কথা কি আর চাপা থাকবে মনে কচ্ছেন?"

"তাইতো!" বলিয়া সকলে মহা চিন্তাযুক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

হরিহর একবার কাশিয়া, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "তা দেখুন, আপনারা ইচ্ছে কল্লে একটা উপায় কত্তে পারেন, যখন বলছেন যে চিঠি পর্য্যন্ত ছাপিয়েছেন, তখন যাতে শেষটা রক্ষা হয়, তা করা তো ভদ্রলোক মাত্রেরই কাজ?

সুরেন্দ্র ও সত্যপ্রিয় যুগপৎ বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই, তা আর বলতে! তা উপায়টা কি বলছেন, আজ্ঞা করুন!"

ঈষৎ চিন্তার পর হরিহর বলিলেন, "দেখুন, আমার পরিচয় বোধ হয় আপনারা শুনে থাকবেন। তা—আমারই একটী ভাইঝি আছে, আমরা মিত্তির, আর রামদুলালের মেয়ের সঙ্গে যদি হতে পারে, তবে এও হতে

পার্শ্বে, কাজেই বেশ মিলে যাচ্ছে, মেয়েটীকে দেখে যদি আপনাদের পছন্দ হয়, অপছন্দ কখনই হবে না, তা হলে সেটীর সঙ্গেই কেন আপনারা এ শুভকার্য্যটা করুন না। রামদুলালের তুলনায় আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা হলে, নিজমুখে আর কি বলবো, আপনাদের অসুখী হবার কোন কারণ থাকবে না। অথচ সমাজের এই একটা কেলেঙ্কারীর মধ্যে পড়তে হয় না।"

সত্যপ্রিয় বন্ধু চতুষ্টয়ের সহিত একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। তারপর তাহাদিগকে বলিল, "কি বল তোমরা।"

ভবতারণ বলিল, "অতি চমৎকার কথা। আমরা আগে একঘ'রের কথা টের পেলে এ কাজে কখনও হাত দিতাম না, কিন্তু যখন আগুণে হাত দিয়েছি, তখন হাত পুড়েছে, এখনো যদি ফোস্কা হওয়াটা নিবারণ কত্তে পারি, তবে মন্দ কি ?"

ভবতারণের এই কথায় সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

হরিহর বাবু আবার বলিলেন, "তা হলে মেয়েটীকে একবার দেখবেন ?',

সকলেই একবাক্যে বলিল "নিশ্চয়ই ! হয়ে গেলই বা আশীর্ব্বাদ, আশীর্ব্বাদ হয়েও কি বিয়ে ভেঙ্গে যায় না।"

তৎক্ষণাৎ হরিহর অন্তঃপুরাভিমুখী হইলেন। সত্যপ্রিয় প্রভৃতি মুখে চাদর দিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

[৭]

অল্পক্ষণ পরেই জনৈক ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে কর্ত্তা অন্তঃপুরে ডাকিতেছেন।

পাঁচজনেই চাকরের অনুবর্ত্তী হইয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন।

সেখানে অলঙ্কার বস্ত্রে সুশোভিতা, হরিহরের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখান হইল। সত্যপ্রিয় বলিল "বাঃ, চমৎকার মেয়ে, এমন মেয়ে থাকতে আমরা কি না অত বড় একটা সামাজিক কেলেঙ্কারীর মধ্যে পা দিচ্ছিলাম! যাক, ঈশ্বর আছেন তো! উঃ যে ভাবনাই আমাদের হয়েছিল, চিঠি পর্য্যন্ত ছাপিয়ে ফেলেছিলাম।"

হরিহর জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, মেয়ে পছন্দ হোল তা হলে ?',

২।৩ জন একসঙ্গে বলিল, "নিশ্চয়ই।"

"তা বেশ, আমাকেও ঈশ্বর জুটিয়ে দিলেন। আপনারা যখন সমস্ত বন্দোবস্তই করেছিলেন, তখন আর কিছু ভাবতে হবে না। এখন অনুমতি করেন তো তা হলে—

রাধানাথের খুল্লতাত বলিলেন, "এর আর অনুমতি করা করি কি ? আমরা সকলেই একবাক্যে বলছি যে ঐ দিনে ঐ লগ্নেই আপনার ভাইঝির সঙ্গেই বাবাজীর শুভকার্য্য করবো। আপনি সেই অনুসারেই প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। গিনি দুখানা দিয়ে বোসজা মহাশয়ের মেয়েকে আশীর্ব্বাদ কল্লাম, তা না হলে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকেই আশীর্ব্বাদ করে যেতাম—"

সত্যপ্রিয় বলিল, "আর যদি বলেন, তা না হয় আমার এই ঘড়ীর চেনটা দিয়েই—"

বাধা দিয়া হরিহর বলিলেন, "আরে রামচন্দ্র, ভদ্রলোকের কথাই যথেষ্ট, এর আর আশীর্ব্বাদ করা করি কি, ওটা একটা প্রথা বৈ ত নয়।" তার পর মাথাটা একটু চুলকাইয়া বলিলেন "তা হলে ছেলেটী একবার দেখার বন্দোবস্ত—"

ভবতারণ বলিল "ওটাও একটা প্রথা। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে কখন কি করে ছেলে দেখবেন ? ছেলের গুণাগুণ বংশপরিচয়

সবই ত শুনেছেন। কেবল তার চেহারাটা কেমন, অর্থাৎ কানা খোঁড়া কিনা এইমাত্র দেখা। নয় কি ?"

হরিহর বলিলেন "হ্যাঁ, তা বৈ কি! তা ছাড়া আর কি ?"

ভবতারণ বলিল, "ছেলের ফটোগ্রাফ বোসজা মহাশয়ের কাছে আছে। এখনই একটা ছুতো করে আনিয়ে দিচ্ছি।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই একজন যাইয়া রাধানাথের ফটোগ্রাফ আনিয়া হরিহরকে দিল।

সত্যপ্রিয় বলিল, "তা মশাই একটা অনুরোধ কিন্তু রাখতে হবে।"

"কি ?"

"ওঁদের অবস্থা ভাল নয় বলে আমরা টাকাকড়ি সম্বন্ধে কিছু পীড়া-পীড়ি করি নি। কিন্তু আপনি যখন অবস্থাবান লোক, তখন আপনাকে আর কি বলবো, টাকাকড়ির কথা আমি কিছুই বলতে চাই না, তবে বর অনেকদূর থেকে আসবে, সুতরাং ষ্টেশন থেকে যাতে, একটু ভাল প্রসেসন করে আসে, কেবল সেই ভারটা আপনার নিতে হবে। কিছুই নয়, কেবল গোটাকতক আলো আর একটা ব্যাণ্ড।"

সহাস্যে হরিহর বলিলেন "নিশ্চয়ই করবো, এ. আর বেশী কথাটা কি, আমার সাধ্যমত আমি আলো আর বাজনার ব্যবস্থা করবো। কোন ট্রেণে আসা হবে সেটা কাল পরশুর ভেতর জানিয়ে দেবেন।"

রামদুলাল বসুর বাটীতে পর্য্যাপ্ত আহার করিয়াও হরিহর মিত্রের ভবনে সকলে পুনরায় উত্তমরূপে জলযোগ করিয়া রওনা হইবার উদ্যোগ করিলেন। হরিহর বলিলেন,—"এই রৌদ্রে আর কেন কষ্ট করে বাই-সাইকেলে যাবেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি গরুর গাড়ী আনিয়ে দিচ্ছি।"

অল্পক্ষণ পরেই তিনখানি গোযান আনীত হইল। দুইখানিতে কয়-

জনে উঠিল, বাকী একখানিতে পাঁচখানি বাইসিকেল বোঝাই করা হইল। যাইবার সময় হরিহর একটু মৃদুস্বরে বলিলেন, "দেখুন, আমার সঙ্গে এই যে বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল, একথা অন্য কাউকে এখন ভাঙ্গবেন না। রামদুলালকেও আপনাদের জানাবার কোন দরকার নাই, তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আমিই বরং জানাব'থন। বুঝেছেন ?"

তাহাতে স্বীকৃত হইয়া সকলে গোযানে গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। ষ্টেশনে পৌছিয়া উচ্চহাস্যের সহিত সত্যপ্রিয় বলিল, "একেই বলে গাছে না উঠতে এক কাঁদি। আমরা যে প্লট তৈরী করে গিয়ে লোকটার সঙ্গে দেখা কল্লাম, তার কিছুই কোত্তে হল না, অথচ লোকটা আপনি এসে কেমন ফাঁদে পা দিলে। ভগবানের কারসাজি, খোদার মার বাবা !"

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। ভবতারণ বলিল "শুধু তাই ? তার উপর আলো আর বাজনা এই দুটো হোল গিয়ে penalty.

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

[৮]

উভয় বাটীতেই বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। হরিহর মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হঠাৎ কোথায় এবং কাহার সহিত স্থির হইয়া গেল তাহা রামদুলাল কিছু ভাবিয়া পাইল না।

নিজের বুদ্ধিকে অসংখ্য প্রশংসা করিয়া হরিহর মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে কন্যার বিবাহের সমস্ত যোগাড় করিয়া রামদুলাল যখন দেখিবে যে বরসহ বরযাত্রীগণ তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত বিবাহ দিতেছে, তখন তাহার মনোভাব যাহা হইবে তাহা

বর্ণনাতীত ; এবং তাহার সহিত ধৃষ্টতা প্রকাশের আশু পরিণাম যে কি, তাহা তিনি সেই দিনই রামদুলালকে বর্ণে বর্ণে বুঝাইবেন।

এই ঘটনার প্রায় তিন দিন পরে হরিহর মিত্র একখানি পত্র পাই-লেন। তাহাতে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র নামক জনৈক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন যে তাঁহাদের কুলপ্রথা অনুসারে বর সভাস্থ হইলেই কন্যার গাত্রহরিদ্রা দেওয়ার নিয়ম। সুতরাং গাত্রহরিদ্রা পাঠান হইতেছে না দেখিয়া মিত্র মহাশয় যেন উদ্বিগ্ন বা মনঃক্ষুণ্ণ না হন।

সেই ডাকেই রামদুলাল পঞ্চাশ টাকার একখানি মনিঅর্ডার ও এক-খানি পত্র পাইয়া জানিলেন, যে পথের দুরত্ববশতঃ গাত্রহরিদ্রা পাঠানর সুবিধা হইল না, সেই কারণ মণিঅর্ডার যোগে গাত্রহরিদ্রা বারদে ৫০৲ টাকা পাঠান হইল এবং বন্ধু মহাশয় যেন সেজন্য মনঃক্ষুণ্ণ না হন এবং একথা গোপন রাখেন।

উভয়েই মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ ছিল না, সুতরাং নিজ নিজ পত্র পাইয়া উভয়েই মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন।

* * * * *

নির্দ্ধারিত দিনে যথাসময়ে প্রায় ২০ জন বরযাত্রীসহ বর ষ্টেশনে নামিল। হরিহর মিত্র বরযাত্রীগণের জন্য ৬।৭ খানি গোযান, এবং বর ও পুরোহিতের জন্য ২খানি পাল্কী পূর্ব্বেই ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দুই দল ব্যাণ্ড এবং অ্যাসিটিলিন গ্যাসের নানারংয়ের আলো সহ প্রায় ১৫।১৬ জন লোক বরের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

শোভাযাত্রা গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে হরিহর মিত্র আত্মীয় স্বজন ও লোকজন সহ বরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল যে আলো বাজনাসহ পাল্কী এবং গোযানশ্রেণী তাঁহার বাটীর দিকে না আসিয়া রামদুলালের গৃহদ্বারে সমবেত হইল।

হরিহর তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া গেলেন, দেখিলেন হাস্যমুখে রামদুলাল পাল্কী হইতে বর নামাইতেছে। বরযাত্রীগণ ইতিমধ্যেই নিজ নিজ যান হইতে নামিয়া সমাগত লোকমণ্ডলীর মধ্যে ছাপান প্রীতি-উপহার বিতরণ করিতেছে।

অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হরিহর ঝড়ের মত বেগে গিয়া বরকর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে নাতিবৃদ্ধ স্থূলোদর জনৈক বাবু। আশেপাশে আসাসোটা লইয়া, পাগড়ী বাঁধিয়া, কয়েকটী দ্বারবান দাঁড়াইয়া আছে। রক্তবর্ণ চক্ষে তিনি বলিলেন "মশাই, এ কি রকম ভদ্রতা!"

স্মিতমুখে বরকর্ত্তা বলিলেন, "কে আপনি? কি চান?"

"কে আমি? কি চাই? ন্যাকামো পেয়েছ আমার সঙ্গে? হরিহর মিত্তিরের সঙ্গে চালাকী! চর্কী ঘুরিয়ে দেবো না!"

বরকর্ত্তা বলিলেন, "কি বলছেন আপনি পাগলের মতন, এটা তো পাগলামীর জায়গা নয়!"

হরিহর গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমার সঙ্গে এ চালাকীর মানে কি?"

বরকর্ত্তা বলিলেন, "আমি ত আপনার কথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, কে আপনি? চালাকিটা কি করা হোল আপনার সঙ্গে।"

অত্যন্ত রাগের সহিত গর্জ্জন করিতে করিতে হরিহর ব্যাপারটা বলিলেন। শুনিয়া বরযাত্রীগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

হরিহর আবার বলিলেন, "কোথায় গেল সে সব হারামজাদা ব্যাটারা, ভদ্রলোক সেজে এসেছিল আমার সঙ্গে চালাকী কত্তে। আমার ব্যাণ্ড, আমার আলো, আমার পাল্কী, সব আমার বাড়ীতে, বিবাহসভা করে, লোকজন নেমন্তন্ন করে এ কি অপমান!"

কিন্তু চারিদিক চাহিয়াও তিনি সত্যপ্রিয় বা সেদিনের কাহাকেও

দেখিতে পাইলেন না। সে পাঁচজনের মধ্যে কেহই আসে নাই! তিনি তখন চীৎকার করিয়া বলিলেন,"আচ্ছা রামদুলাল, দাও দেখি কেমন করে বিয়ে দেবে, সব আমি দক্ষযজ্ঞ করে দেবো।"

বরকর্ত্তা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "মশাই, যদি পাগলের মত ওরকম চেঁচামেচি করেন, তা হলে এখনিই আপনাকে পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করে দেব। তার চেয়ে এইবেলা খুঁজে পেতে দেখুন যদি কোথাও পাত্তর টাত্তর যোগাড় কোত্তে পারেন।"

হরিহর এইবার বিপন্ন হইলেন। একবার চারিদিকে চাহিয়া, তার পর কাঁদ কাঁদ স্বরে বরকর্ত্তার হাতদুখানি ধরিয়া বলিলেন "এঁ্যা, তা হলে কি হবে মশাই আমার? এখন উপায়? আমার বাড়ীতে যে নিমন্ত্রিত লোকজন সবাই এসেছেন।"

মৃদু হাস্যের সহিত তিনি বলিলেন, "তা আমি আর কি জানি বলুন, আমি ত আপনাদের দেশে মোটে আজ এসেছি বৈত নয়। আমি আর কি করবো, বেই মশাইকে বলুন, তিনি যা করেন।"

বরযাত্রীগণ পরস্পর গা টেপাটিপি করিয়া হাসিতেছিল।

তখন সেই সমবেত জনসঙ্ঘ মধ্যে হরিহর ছুটিয়া যাইয়া রামদুলালের হস্তদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "রামদুলাল, ভাই, আমার জাত মান রক্ষা কর।"

রামদুলাল বলিল, "তা আমি কি করবো?"

"তুমি সব পার ভাই, উদ্ধার কর আমায়, নৈলে আমাকে দাঁড়িয়ে অপমান হতে হয়।"

রামদুলাল একটু চিন্তা করিল। তার পর বলিল "এই বিয়েতে আমার ছোট শালা এসেছে। তার এখনও বিয়ে হয়নি। ছেলেটিও নেহাত মন্দ নয়, যশোরে মোক্তারী করে। তার সঙ্গে দেবেন?"

"হ্যাঁ ভাই, তাকেই এনে দাও ভাই, তাকেই আমার ভাইঝি সম্প্রদান করবো।"

মৃদু হাসিয়া রামদুলাল বলিল, "কিন্তু সে যে 'একঘ'রের' শালা মিত্তির মশাই।"

হরিহর মিত্র বলিলেন, "ক্ষমা কর ভাই আমায়। আমার আক্কেল সেলামী হয়েছে। তোমার সম্বন্ধীকে ডেকে নিয়ে এসো, আমায় আর লজ্জা দিও না।"

অগত্যা রামদুলালের শ্যালক হরেন্দ্রনাথকে আনিয়া সেই পাল্কীতেই বসাইয়া হরিহর মিত্র নিজগৃহে গেলেন।

পরদিন প্রত্যুষে সমাগত সমাজমণ্ডলীর মধ্যে নানাযুক্তি দেখাইয়া আবার রামদুলালকে সমাজে গ্রহণ করা হইল। নিমন্ত্রিত সমাজের প্রতিনিধিবর্গ উদরপূর্ত্তি করিয়া উভয় বাটীতেই চর্ব্ব্য চোষ্য ভোজন করতঃ উভয় দম্পতীরই কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন।

গুপ্তধন

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইতে তখনও বিলম্ব ছিল, এমন সময়ে ভৃত্য রঘুয়া আসিয়া আমাকে জানাইল যে জনৈক বাবু আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। বিরক্ত হইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াই দেখি, প্রিয়বন্ধু সতীশ।

সোল্লাসে আমি বলিলাম, "হ্যালো সতীশ! হঠাৎ এই ভোরের বেলায় কি মনে করে? কবে কলকাতায় এসেছ? খবর কি সব?"

সতীশ থিয়েটারের গানের সুর করিয়া বলিল, "আজ খবর চমৎকার।"

মৃদুহাস্যের সহিত আমি বলিলাম, "বল কি হে, ব্যাপারখানা কি?"

সে বলিল, "চল তোমার বৈঠকখানায়।"

রঘুয়া বৈঠকখানার দ্বার খুলিয়া দিল, উভয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। সতীশ বসিলে আমি বলিলাম, "বসো তুমি একটু, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি।"

ষ্টেট্‌সম্যানের পিয়ন বৈঠকখানার খোলা জানালা দিয়া খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল, সতীশ সেখানি তুলিয়া লইয়া বলিল, "একটু শীগ্‌গির করে এস।"

বাল্যকাল হইতে আমরা উভয়ে একত্র থাকিতাম, এক ক্লাসেই পড়িতাম। আমাদের ক্লাসের মধ্যে তাহার মত দুর্দ্দান্ত ও দুর্ব্বিনীত ছাত্র আর কেহ ছিল না। মনে পড়ে, বুয়র যুদ্ধের সময় যখন আমাদের

বাড়ীর সম্মুখ দিয়া সৈন্যদল ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে যাইত, তখন আমি ছাদের উপর হইতে সভয়ে তাহাদের প্রতি সকৌতুক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতাম, রাস্তায় বাহির হইতে সাহসে কুলাইত না, কিন্তু সতীশ নির্ভয়ে রাস্তায় গিয়া তাহাদের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিত। সে ত গেল বাল্যকালের কথা।

একই সঙ্গে উভয়ে কলেজ ত্যাগ করিবার পর আমি গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস লইয়া কেরাণীগিরি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সতীশ নানা প্রকার অদ্ভূত কার্য্যাবলীর প্রস্তাব আমার নিকট মধ্যে মধ্যে উত্থাপিত করিয়া, তারপর কোথায় অদৃশ্য হইত জানিনা। সে যে কি কার্য্যে লিপ্ত থাকিত তাহাও আমার অজ্ঞাত, তবে কখনও তাহার বাবুগিরির ন্যূনতা দেখি নাই।

হাত মুখ ধুইয়া অল্পক্ষণ পরেই বৈঠকখানায় আসিলাম, রঘুয়া দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিল।

সতীশকে বলিলাম, "কি ব্যাপারখানা বল দেখি, কবে কলকাতায় এসেছ ?"

সে বলিল, "ব্যাপার খুব ভয়ানক এবং অত্যন্ত গোপনীয়।"

রঘুয়াকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলাম। সে চলিয়া গেলে আবার বলিলাম, "কি রকম ?"

সে বলিল, "এই তুচ্ছ কলমপেষা কেরাণীগিরি ছেড়ে দিয়ে রাতা-রাতি বড় মানুষ হতে চাও ?"

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি হে, ব্যাপারখানা কি খুলে বল না।"

সতীশ বলিল, "কিন্তু আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, এ কথা কারও কাছে প্রকাশ করবে না, এমন কি তোমার স্ত্রীর কাছেও না।"

আমি বলিলাম, "ক্ষেপেছ না পাগল হয়েছ, আমি কি কোন কথা কারু কাছে বলি ? এই তো তুমি কতরকম ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে, পাঞ্জাব মেলে হিন্দু ডাইনিং কার খোলা, সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে লাইট রেলওয়ে খোলা, মোগকে রুবি মাইন কেনা, এ সব ব্যাপার কি কারু কাছে প্রকাশ করেছি ? ঘুণাক্ষরেও নয়।"

সে বলিল, "নাহে না, এবার বাস্তবিকই কথাটা গুরুতর।"

"কি রকম ?"

সে বলিতে আরম্ভ করিল, "রাণাঘাটের কাছে দেবগ্রাম বলে একটা জায়গা আছে জান ?"

আমি কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া বলিলাম, "সকাল বেলা, ছি ছি, খাওয়াদাওয়ার আগে কোনও লোক সে জায়গার নাম মুখে আনে না, আর তুমি কি না এই ভোরবেলা সেই নাম স্বচ্ছন্দে কল্লে ? অদৃষ্টে আজ আর অন্ন নেই বোঝা যাচ্ছে।"

সে বলিল, "ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। আমি যা বলি, বেশ করে মনোযোগ দিয়ে শোন।"—বলিয়াই সে আরম্ভ করিল, "সেই দেব-গ্রামে দেবল রাজার রাজধানী ছিল জান ?"

"শুনেছি বটে।"

"হ্যাঁ, ছিল। সেখানে রাজ্যের অনেক ধ্বংসাবশেষ, অনেক প্রাচীন-কীর্ত্তি সব আছে। সেকালে জায়গাটা বেশ একটা সমৃদ্ধিশালী জায়গা ছিল। রাজবাড়ীর চারিদিকে গড়খাই কাটা ছিল। একটা রাজার রাজধানী আর কি ! কিন্তু এখন সেখানে কেবল ধ্বংসস্তূপ আর বনজঙ্গল।"

চায়ের পিয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া বলিলাম, "তার পর ?"

সতীশ বলিল, "সেই খানেই আমি ক'দিন ধরে ছিলাম। অনেক বিষয়ের তদন্ত করেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বিষয়ে ?"

সতীশ বলিল, "সেই কথাই তোমাকে আমি বলতে এসেছি।"

"বেশ, বলে যাও।"

সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "দেখ, কোন জায়গা থেকে খুব বিশ্বস্তসূত্রে আমি একটা খবর জানতে পারি।"

"কি খবর ?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দেবল রাজা কি করে মারা যান তা জান ?"

আমি বলিলাম, "না, সে কথা জানবার তো কোন প্রয়োজন নেই।"

"খুব প্রয়োজন আছে, শোন বলি। তিনি কোন যুদ্ধজয় করে আসবার সময়, বাড়ীতে খবর পাঠাবার জন্মে জয়ের চিহ্নস্বরূপ একটি শাদা পায়রা উড়িয়ে দিতে বল্লেন। তাঁর কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে শাদা পায়রা না উড়িয়ে একটি লাল পায়রা উড়িয়ে দিলে। পায়রা এসে দুর্গে পৌঁছিল। রাণী ও অন্যান্য যারা ছিলেন, তাঁরা লাল পায়রা দেখে বুঝলেন যে, যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে, মুসলমানেরা এসে সব লুঠে নেবে, সুতরাং নিজেদের ধর্ম্মরক্ষার জন্মে তাঁরা সকলে সতী হয়ে দগ্ধ হলেন।"

আমি বলিলাম, "এত খবর তো জানতাম না ; তার পর ?"

"রাজা এসে দেখলেন, সর্ব্বনাশ। দুঃখে, শোকে, তিনিও বৈরাগ্য নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। তার পর সব ধ্বংস হয়ে গেল।"

সতীশ চুপ করিল। আমি বলিলাম, "এ তো সব ঐতিহাসিক ব্যাপার। এর সঙ্গে তোমার কথার সংস্রব কি ?"

সে বলিল "খুব সংস্রব আছে। আমি তোমাকে যা বলবো, এই দেবল রাজার ব্যাপারটা হল তার ভূমিকা।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "কি রকম ?"

সে বলিল, "শোন তবে এইবার। আমি খুব বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে, দেবল রাজার একটা খুব মস্ত টাকার ঘর ছিল। সেই ঘরে তাঁর বিস্তর ধনরত্ন সব লুকানো থাকতো। যখন রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যায়, তখন সে ঘরটা নিরাপদ ছিল, তার পর কালক্রমে মাটির ভিতর বসে গিয়েছে—এই খবর আমি পেয়েছি।"

আমি বলিলাম, "বল কি হে, এ যে পরিষ্কার আরব্য উপন্যাস।"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত সে বলিল, "ওই তো! কোন কথা বিশ্বাস কত্তে চাও না, ওই তো তোমাদের দোষ। আগে শোনই, তার পর কি হল।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা বল।"

"কথাটা প্রথমে শুনে আমারও ঐরকম অবিশ্বাস হয়েছিল। কিন্তু তবু একটা কৌতূহল হওয়াতে আমি নিজে সেখানে গিয়ে প্রায় ১০।১২ দিন কাটালাম। রাজবাড়ীর ধ্বংসের মধ্যে, বনজঙ্গলের ভিতর, অনেক খুঁজে খুঁজে, শেষে পরশু দিন সে জায়গাটা আমি আবিষ্কার করেছি।"

আমি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলাম, বলিলাম, "বল কি হে, দেবল রাজার সেই ধনাগার, সেই আরব্য উপন্যাস, সত্যি ভেবে তুমি নিজে সেইখানে গিয়ে সেই ঘর আবিষ্কার করেছ ? আরে না না !"

আমাকে স্থির হইতে উপদেশ দিয়া সতীশ বলিল, "সেই ঘরটাই যে আবিষ্কার করেছি তা নয়, তবে কতকটা তাই বটে।"

"অর্থাৎ ?"

সে বলিল, "ক্রমাগত দিন কয়েক ধরে সেইখানে ঘুরে বেড়াবার পর, একদিন খুব গভীর বনের ভিতর একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কতকগুলো

সিঁড়ি দেখতে পেয়ে, তার ভিতর পর্য্যন্ত নেমেছিলাম। কিন্তু ভিতরে যে রকম অন্ধকার, আর এমন একটা বিটকেল দুর্গন্ধ পেলাম, যে চলে আসতে হ'ল। আমার বোধ হয়, সেই খানেই একটা ক্লু (Clue) পাওয়া যেতে পারে।"

আমার হৃৎপিণ্ড তখন এত জোরে স্পন্দিত হইতেছিল যে, তাহার স্পন্দন শব্দ বোধ হয় সতীশও শুনিতে পাইয়াছিল। একটু চিন্তার পর সতীশকে বলিলাম, "সেই ঘরটাই যে দেবল রাজার ধনাগার তার প্রমাণ কি? সেটা তো না'ও হতে পারে।"

সতীশ আমাকে বুঝাইয়া দিল যে ঠিক সেই কক্ষটি ধনাগার না হইলেও, তদ্বারা কক্ষান্তরে অনায়াসেই যাওয়া যাইতে পারে এবং পরিশেষে ধনাগারে উপনীত হওয়ার অসম্ভবনীয়তা কিছুই নাই।

আমি বলিলাম, "তা, এখন তুমি কি কত্তে চাও?"

সে বলিল, "সেই জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি। একলা তার ভিতর যেতে আমার সাহস হয় না। তোমার সঙ্গে আশৈশব ভাইয়ের মতন কাটিয়েছি, আজ তুমিও অবস্থাবান নও, আমি তো পথের ভিখারী। যদি ঈশ্বর মুখ তুলে চান, দুজনেরই দুঃখের দিন অবসান হতে পারে।"

আমি বড়ই সমস্যায় পড়িলাম। কি যে করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; সুতরাং নীরব রহিলাম। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া সতীশ আবার বলিল, "জীবনে যদি একটা adventureই না হ'ল, তবে আর জীবনটার মধ্যে পদার্থ রইল কি? ঘড়ীর কাঁটার মতন দশটা পাঁচটায় আফিসে গিয়ে কলম পিষলে, বছর কতক পরে যে আর মনুষ্যত্ব থাকবে না। এ জীবন 'নিশার স্বপন' হয়ে দাঁড়াবে যে।"

আমি তখনও নীরব।

সতীশ আবার বলিতে লাগিল, "আফিসে হপ্তা খানেকের ছুটি নিয়ে,

দুজনে যাই চল। বাড়ীতে বলবে যে বেড়াতে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে বলবে যে শিকার কর্ত্তে এসেছি। দেখই না কেন অদৃষ্টটা একবার পরীক্ষা করে। যদি ঈশ্বর দিন দেন, তবে তো কথাই নেই। না হয়, একটু বেড়িয়ে আসাই লাভ। এতে তো আর কিছু ক্ষতি হচ্ছে না। এখন শীতকালে পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ার ভয়ও নেই, পথও দূর নয়।”

প্রথমে আরব্যোপন্যাস বলিয়াই হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সতীশের কথাগুলি ক্রমে যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় আমাকে সেই দেবগ্রামের দিকে টানিতে লাগিল; কে যেন আমার কাণে কাণে বলিতে লাগিল যে দেবল রাজার অগণিত ধন ঐশ্বর্য্য আমাদের জন্যই সেই অতীতকাল হইতে ভূগর্ভে অপেক্ষা করিতেছে।

অবশেষে তাহার প্রস্তাবে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। বলা বাহুল্য, সতীশ তাহাতে খুবই আনন্দিত হইল এবং কাহারও নিকট এ কথার বাষ্পও প্রকাশ করিতে নিষেধ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সতীশ সেদিন আহারাদি করিয়া আমারই বাসায় থাকিল। স্থির হইল যে পরদিন প্রত্যূষে আমরা যাত্রা করিব। আমি যথাসময়ে আফিসে যাইয়া সাত দিনের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া আসিলাম।

আমাদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে সতীশ আমাকে জানাইল যে, প্রত্যূষে চাঁদপুর মেলে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া, সাড়ে আট ঘটিকার মধ্যেই রাণাঘাটে পৌছিয়া, সেখানে স্নান সমাপন করতঃ পুনরায় রেল-যোগে দ্বিপ্রহরের বহুপূর্ব্বেই আমরা গাংনাপুর ষ্টেশনে নামিতে পারিব। সেখান হইতে দেবগ্রামের দূরত্ব অতি সামান্য।

তাহার কথা অনুসারেই কার্য্য হইল। রাণাঘাটে পৌছিয়া সে চুর্ণী নদী হইতে স্নান করিয়া আসিল, আমি আর স্নান করিলাম না। বনগ্রামাভিমুখী ট্রেণে উঠিয়া যখন গাংনাপুর ষ্টেশনে নামিলাম, তখনও সাড়ে এগারটা বাজে নাই। ষ্টেশনের সন্নিহিত মুখুয্যের হোটেলের খাতায় কাল্পনিক নাম ধাম্ ও গন্তব্যস্থান লেখাইয়া আহার করিয়া লইলাম।

ষ্টেশন হইতে দেবগ্রাম প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। সুতরাং গোযান সংগ্রহের চেষ্টায় অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় একটা বৃহৎ বটগাছ ছিল, তাহারই ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। আবার যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই সতীশ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রমেশ! এইখান থেকেই আমরা জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিই এস।"

বিস্মিত হইয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জিনিষপত্তর আবার কি গুছিয়ে নেব?"

কোন উত্তর না দিয়া সে তাহার পকেট হইতে দুইটী দেশলাই, একটী ইলেট্রিক পকেট ল্যাম্প ও পিজবোর্ডের সরু একটী বাক্স বাহির করিয়া আমাকে দিল।

পিজবোর্ডের বাক্সটী খুলিয়া সবিস্ময়ে আমি দেখিলাম, তাহার মধ্যে চামড়ার খাপ সমেত একখানি ছোরা রহিয়াছে। খাপখানির ভিতর হইতে ছোরাখানি বাহির করিবামাত্র তাহা সূর্য্যালোকে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। দেখিলাম সেখানি সম্পূর্ণ নূতন।

আমি তাহাকে বলিলাম, "এসব আবার কি? ছোরা ছুরী কেন?"

সে বলিল, "যাচ্ছি কোথায় তার তো স্থির নেই, কাজেই একটা আত্মরক্ষার জিনিষ কাছে থাকাটা কি ভাল নয়? আমার কাছেও আছে"—বলিয়া সে তাহার অপর পকেট হইতে আরও দুটী দেশলাই,

ও আর একটী বিদ্যুৎ বাতি বাহির করিল ; তার পর কোটের ভিতরের পকেট হইতে চামড়ার একটী ক্ষুদ্র কেস বাহির করিয়া আমার হস্তে দিল। কেসটী খুলিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমি দেখিলাম যে, তাহার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পিস্তল রহিয়াছে।

সে বলিল, "পিস্তলটা আমার কাছে রইলো, ছোরাখানা তোমার কাছে থাক, আপদ বিপদের কথা তো বলা যায় না।"

আমি কোন কথা কহিলাম না। পিস্তল ও ছোরা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা যে কাঁপিয়া উঠে নাই, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। মসীজীবি কেরাণী আমি, আমার কাছে এসব কেন ? সতীশকে বলিলাম, "না ভাই থাক্‌গে, আর কাজ নেই গিয়ে, এমনিই বরং এদিক ওদিক বেড়িয়ে, চল সন্ধ্যার ট্রেণে ফিরে যাওয়া যাক।"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা পাগল যা হোক। এতখানি এসে, শেষে কি না মেয়ে মানুষের মত একেবারে ভয়েই আড়ষ্ট। ভীতু অপবাদটা তো ঐ জন্যেই বাঙ্গালীজাতের একচেটে হয়েছে।"

বলিয়াই সে উঠিল। আমি নীরবে তাহার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, মন বড় ভাল ছিল না।

কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, পীতবর্ণের একখানি গাত্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া, দীর্ঘশ্মশ্রু জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি সেই দিকে আসিতেছেন। আমার একটু গা-ঢাকা দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সতীশ সেরূপ করিতে নিষেধ করিল। অল্পক্ষণ পরেই সে ব্যক্তি সেখানে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাইদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?"

সতীশ বলিল, "কলকাতা থেকে।"

"কতদূর যাওয়া হবে ?"

সতীশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "কিছু ঠিক নেই।"

বৃদ্ধ যেন একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম, ঠিক নেই কি রকম? পথ চলেছেন, অথচ কোথায় যাবেন জানেন না? এ কি রকম মশাই?"

সতীশ তখন বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কোথায় যাব ঠিক নেই বটে, আমরা শিকার কর্ত্তে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শিকার কর্ব্বেন? খরা? না ঘুঘু টুঘু?"

"যা পাই।"

"কি দিয়ে মারবেন?"

সতীশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন মশাই অমন কচ্ছেন? আমাদের তাঁবু আছে ষ্টেশনের কাছে, হাতী, লোকজনও আছে সেইখানে, আমরা দুজনে বনটা একবার দেখতে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ তখন বলিলেন, "ওঃ, তা দেখুন মশাইরা, ওই উত্তরের খালের ধারে অনেক বুনো শূয়োর আছে। যদি মারতে পারেন, তবে আপনাদেরও আমোদ করা হয়, আমরাও রক্ষে পাই। মশাই, বলবো কি দুমাস থেকে একেবারে—"

বন্যবরাহ কর্ত্তৃক তিনি কিরূপে উৎপীড়িত হইয়াছেন, সে ইতিহাস শুনিবার ধৈর্য্য তখন আর আমাদের ছিল না। বেলা দ্বিপ্রহর, রৌদ্রে আমাদের মাথা ফাটিবার উপক্রম হইতেছিল। সতীশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বলিল, "এসো হে।" বৃদ্ধকে বলিল, "আচ্ছা দেখবো'খন মশাই, এখন আমরা বড়ই ব্যস্ত।"—বলিয়া অগ্রসর হইল, আমিও চলিলাম।

বৃদ্ধ কিছুকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতে লাগিলেন, তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

অনেক বাঁশবাগান, ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ প্রভৃতির ভিতর দিয়া আমরা ক্রমে জঙ্গলে গিয়া পড়িলাম। এক জায়গায় বৃহৎ একটা খাত মতন ছিল, তাহাতে জলের সম্পর্কও ছিল না, বরং স্থানে স্থানে খাতের মধ্যেই জঙ্গল এত নিবিড় হইয়াছিল যে, দেখিলে বোধ হয় তাহার মধ্যে অনায়াসেই ব্যাঘ্র লুকাইয়া থাকিতে পারে। সতীশ আমাকে জানাইল যে সেই খাতই দেবল রাজার গড় নামে খ্যাত।

খাতের ধার দিয়া, বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া, গাছের কাঁটা হইতে কষ্টে পরিধেয় বস্ত্র বাঁচাইয়া, আমরা ক্রমেই নিবিড় বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একজায়গায় একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া ছিল, আমরা উভয়েই একটু বিশ্রাম করিবার জন্য তাহাতে বসিলাম। সতীশ বলিল, "রমেশ, ক্ষিদে পেয়েছে তোমার?"

হোটেলের কদর্য্য অন্ন আহারের পর এই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে পরিশ্রম করিয়া আমি বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সতীশের কথার উত্তরে বলিলাম, "পেলেই বা এখন কি করবো, খাবার পাবো কোথায়? দণ্ডকারণ্য নয় যে ফলটল খেয়ে একরকমে কাটান যাবে। ফলের মধ্যে তো দেখছি কেবল তেলাকুচো আর দেশী কুল। দুটার মধ্যে একটাও তো লোভনীয় নয়।"

সতীশ বলিল, "দেখ, অত বোকা আমি নই, আমার কাছে আছে কিছু, পথ চলতে হলে নিঃসম্বলে বেরুনো উচিত নয়।"—বলিয়াই কোটের তলার সার্টের পকেট হইতে একখানি পাঁউরুটী বাহির করিল।

ক্ষুধা যথেষ্ট পাইয়াছিল, উভয়ে নিমেষের মধ্যে সেই শুষ্ক পাঁউরুটী উদরসাৎ করিলাম। তারপর আবার অগ্রসর হইলাম।

নানা পথ ঘুরিয়া, নানা স্থান দিয়া অবশেষে যেখানে আমরা উপস্থিত হইলাম, সেখানে ভয়ানক জঙ্গল। একটা বৃহৎ সর্প প্রায় আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আতঙ্কে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সতীশ বলিল, "ও ঢোঁড়া সাপ, ওতে বিষ নেই, ভয় পেয়ো না।"—বলিয়া আরও একটু অগ্রসর হইল।

সেখানে একটী বৃহৎ প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় দেখাইতেছিল। ঘন জঙ্গলে স্থানটাও প্রায় অন্ধকার।

সতীশ আমাকে বলিল, "এস এইবার আমার সঙ্গে।"

কোন কথা না বলিয়া আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলাম যে এক স্থানে বন-উচ্ছের জঙ্গল হইয়া আছে। এমন নিবিড় ভাবে সেখানে সেগুলি রহিয়াছে, যে তাহার পীতবর্ণ ফুল ও ঘোর সবুজ পাতা ছাড়া নীচের মাটী একটুও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

সেখানে কোন গাছের সরু একটী ডাল মাটীতে পড়িয়াছিল। সতীশ মুহূর্ত্তের মধ্যে সেটিকে তুলিয়া লইয়া ফুলফল সমেত সেই উচ্ছেবনে বদ্ধ করিয়া খুব জোরে এক টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই নিবিড় উচ্ছে-বন কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় একটী বৃহৎ স্তূপাকারে এক পার্শ্বে রক্ষিত হইল।

বিস্মিত ও বিহ্বল নেত্রে আমি দেখিলাম যে সত্য সত্যই সেই উচ্ছে-বনের আচ্ছাদনে বহুপ্রাচীন এক সিঁড়ির ধাপ নীচে নামিয়াছে।

সতীশ আমাকে দেখাইয়া বলিল, "ওই দেখ, দেখছো?"—বলিয়াই সে সোপান পথে অগ্রসর হইল। তাহার পশ্চাতে আমিও অগ্রসর হইলাম। কয়েকটী ধাপ পরেই একেবারে ঘোর অন্ধকার। আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

দেখিলাম সতীশ তৎক্ষণাৎ তাহার পকেট ল্যাম্প বাহির করিয়া

তাহা প্রজ্জলিত করিল। দেখাদেখি আমিও আমার পকেট হইতে আমার ল্যাম্পটী বাহির করিয়া তাহার বোতাম টিপিলাম। স্থানটী তখন বেশ আলোকময় হইয়া উঠিল।

আলোকে দেখা গেল যে সেটী একটী কক্ষ, তাহার মেঝেয় ঘাসও অন্যান্য তৃণগুল্ম জন্মিয়াছে, দেওয়ালের তিনটি দিক আছে, একদিক ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মাকড়সার জালে কড়িকাঠ আচ্ছন্ন হইয়া ছিল এবং স্থানটি হইতে এমন বিকট একটা দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল যে, অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়। সতীশকে বলিলাম, "আর না, উপরে চল, আমার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই।"

আমার কথাগুলি এমন ভীষণরবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল যে, কেবল আমিই চমকিত হইলাম না, সতীশও চমকিয়া উঠিল।

সে বলিল—"তাইতো, দেওয়ালে ত কোন দরজা কিম্বা জানালার চিহ্নও দেখছি নে। তবে যেদিকটা ভেঙ্গে মাটীর ঢিবি হয়েছে, ওখানে যেন একটি খিলানের মত গোল একটা কি উঁচু হয়ে রয়েছে না?"

আমি দেখিয়া বুঝিলাম যে তাহার কথা যথার্থই বটে।

দুর্গন্ধে আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। আমি বলিলাম, "আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে, হাঁপিয়ে মারা যাব শেষে।"

সতীশ বলিল, "আমারও সেই রকম হচ্ছে। আজ চল উপরে যাওয়া যাক্, কাল গ্রামের ভিতর থেকে একখানা কুড়ুল আর একটা কোদাল এনে, ঐ দিকটা খুঁড়বো। আমার কিন্তু খিলানটা দেখে সন্দেহ হচ্চে যে নিশ্চয়ই এখানে কোন দোর ছিল।"

আমি আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া সোপানপথে অগ্রসর হই-

লাম। সতীশও আমার পশ্চাতে আসিল। উপরে উঠিয়া মুক্ত বায়ুর শ্বাস লইয়া যেন বাঁচিলাম।

সতীশ বলিল, "দাঁড়াও, উচ্ছে গাছগুলো যেমন ছিল তেমনি করে আবার রেখে দিই, নইলে কেউ সন্দেহ কর্ত্তে পারে।"—বলিয়া সে উচ্ছেগাছগুলি সেই ডালটির দ্বারা যথাস্থানে রক্ষা করিতে লাগিল, আমিও তাহকে সাহায্য করিতে লাগিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া আমার দুইহস্ত সবলে ধরিয়া ফেলিল। আমি চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই দেখিলাম, সতীশের দুই হস্তও বদ্ধ হইল।

লালপাগড়ী মাথায়, নীলরঙের কোর্ত্তা ও প্যাণ্টুলুনের উপর বেঙ্গল পুলিসের নম্বরাঙ্কিত চাপরাস-পরিহিত দুইজন পশ্চিম দেশীয় কনেষ্টবল কর্ত্তৃক এইরূপে আমরা ধৃত হইলাম।

আমার বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়াছিল। সতীশ কনেষ্টবলদ্বয়কে রুক্ষ ভাবে বলিল—"কেয়া হুয়া, কেয়া? অ্যাঁ?"

কনেষ্টবলদ্বয় কথা কহিল না, ইঙ্গিতে পশ্চাতে দেখাইল। দেখিলাম নিকটেই খাকী সাজে সজ্জিত বেঙ্গল পুলিসের দুইজন কর্ম্মচারী, সম্ভবতঃ সব ইনস্‌পেক্টার। তাঁহাদের ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সেই শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ—আসিবার সময় যে ব্যক্তি বহু প্রশ্নে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সাবইনসপেক্টারদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া শুষ্ককণ্ঠে আমি বলিলাম, "মশাই, এ রকম করে আমাদের গ্রেপ্তার করা হল কেন?"

রহস্যচ্ছলে একজন বলিলেন, "বুঝতে পারা হয় নি বলে। ভুল হয়েছিল আর কি! কৃপা করে মার্জ্জনা করবেন।"

অপর ব্যক্তি বলিলেন, "তা, মশাইদের যে এত নিকটেই আড্ডা, তা আর আমরা কেমন করে জানবো? ভাগ্যে এই রামতনু বাবু ছিলেন"—বলিয়া বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

বৃদ্ধ তাঁহার দীর্ঘশ্মশ্রুমধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিয়া বলিলেন, "কেন বলে আর অকারণ লজ্জা দিচ্ছেন। আমি তো কিছুই নই, আমি ত আপনাদের গোলামের গোলাম বৈ ত নই, যিনি ধরাবার তিনিই ধরিয়ে দিয়েছেন। আর কে ধরাবে বলুন?"

দারোগাদ্বয় মধ্যে একজন বলিল, "এস হে ললিত, বাবুদের কেল্লার ভিতরটা একবার দেখে যাওয়া যাক্, অন্য লোক না থাকলেও বামাল কিছু থাকা আশ্চর্য্য নয়।"

ললিত নামধারী দারোগাটি বলিলেন, "নিশ্চয়ই! আড্ডা যখন ধরা পড়েছে, তখন সবই ধরা পড়বে।"—বলিয়া কনেষ্টবলদ্বয়ের জিম্মায় আমাদের রাখিয়া তাঁহারা সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষ অভিমুখে চলিলেন।

ললিত তাহার সঙ্গীকে বলিলেন, "দেখছ হ্যা শরৎবাবু, ব্যাটারা কেমন উচ্ছেবনটি সাজিয়েছে। পুলিসের বাবারও সাধ্যি নেই যে কোন রকমে টের পায়। উঃ খুব সময়ে এসে পড়েছিলাম যা হোক্।"—বলিয়াই উচ্ছে-কুঞ্জ স্থানান্তরিত করিয়া উভয়ে সেই সোপানপথে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি মশাইরা, বামাল টামাল কিছু থাকে ত বলুন না, কেন আর অনর্থক ভোগান আমাদের।"

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সতীশ ইংরাজীতে বলিল, "Sir, I demand an explanation from you."

উভয় দারোগাই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। যাঁহার নাম শরৎবাবু তিনি বলিলেন, "চলুন মশাইরা আগে, তার পর explanation কেন তার উপরেও যদি কিছু থাকে তাও বুঝিয়ে দেব"—বলিয়াই কনেষ্টবলকে বলিলেন, "লে আও।" তারপর একজন অগ্রবর্ত্তী হইলেন, অপর একজন আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। কনেষ্টবল-দ্বয়ের হস্তে বন্দী অবস্থায় আমরা উভয়ে মধ্যস্থলে রহিলাম। বৃদ্ধ সর্ব্বাগ্রেই ছিলেন।

পথিমধ্যে কোনরূপ বলপ্রয়োগের দ্বারা কনেষ্টবলের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যাপারকে আরও গুরুতর করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না, সুতরাং ভালমানুষের মত নিঃশব্দেই চলিলাম। সতীশও আর বাক্যব্যয় করে নাই।

জঙ্গলের সীমা ছাড়াইয়া কিছুদূরে আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে ছইওয়ালা একখানি গরুর গাড়ী বোধ হয় আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পুলিশ-পরিবেষ্টিত হইয়া তাহার মধ্যে উভয়েই উঠিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গাংনাপুর ষ্টেশনের ল্যাম্প-রুমে আমরা বন্দী হইলাম।

ষ্টেশনে আসিয়া সতীশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই, এ কি রকম ভদ্রতা, নিরীহ লোক আমরা, কি অপরাধে আমাদের উপর এ রকম দুর্ব্ব্যবহার করা হোল?"

ললিতবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, নিরীহ লোক আপনারা ত বটেই, সেই জন্যই অতগুলো কীর্ত্তি মাস দুয়েকের ভিতরে রেখে গিয়েছেন।"

ভয়ে,উৎকণ্ঠায় এবং পরিশ্রমে আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। হায় হায়, কেন এ হতভাগার সঙ্গে আসিয়াছিলাম!

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি মশাই, কি করেছি আমরা মাস দুয়েকের ভিতর ?"

দারোগাদ্বয় যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝিলাম যে, গত ২।৩ মাসের মধ্যেই উক্ত অঞ্চলে ৩।৪টি স্বদেশী ডাকাতী হইয়া গিয়াছে, এবং পুলিস বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছে যে দেবগ্রামের রাজবাটীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিহিত কোন গুপ্তস্থানে সেই সকল দস্যুদলের একটি আড্ডা আছে। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কি বিশেষ প্রমাণ পাইয়া তাঁহারা সশরীরে সেখানে যাইয়া আমাদিগকে একেবারে "Red-handed" অর্থাৎ "রক্ত-মণ্ডিতহস্তে" গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

আমার বক্ষস্থল কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত জগৎটা যেন তখন অন্ধকার-ময় বোধ হইতে লাগিল। সতীশের উপর তখন যে কি আক্রোশ হইতে-ছিল তাহা প্রকাশযোগ্য নহে।

সতীশ আবার বলিল, "মশাই কিন্তু—"

বাধা দিয়া ললিতবাবু বলিলেন, "থাক মশাই, আর কিন্তুতে কাজ নেই, আপনার যা বলবার তা' রাণাঘাটে গিয়ে বলবেন।"

অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণ আসিল। ঠিক দস্যুর ন্যায় প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় আমরা রাণাঘাট ষ্টেশনে যখন নামিলাম, তখন ডাকাত দেখিবার জন্য ষ্টেশন লোকারণ্য হইয়া গেল। এত বিড়ম্বনাও অদৃষ্টে ছিল! তার উপর সমাগত জনমণ্ডলী হইতে উচ্চারিত মন্তব্যগুলি আমার কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল।

রাণাঘাট থানায় যখন নীত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। গৃহে গৃহে শঙ্খঘণ্টা প্রভৃতি মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অল্পক্ষণ পরেই স্বয়ং ইনেস্পক্টর বাবু সেখানে আসিলেন। শরৎ ও ললিত উভয়েই বোধ হয় আমাদের অপরাধটা বেশ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। তিনি আসিয়া দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিবার পূর্ব্বেই আমাদের অঙ্গবস্ত্র খানাতল্লাসী করিবার হুকুম দিলেন।

ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলাম সে রাগে কাঁপিতেছে।

তৎক্ষণাৎ ইউনিফরম পরিহিত একজন রাইটার কনেষ্টবল আসিয়া আমাদের জামা কাপড় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে আমার পকেট হইতে দেশলাই, ইলেকট্রিক পকেট ল্যাম্প, ও ছোরাখানি বাহির হইয়া পড়িল। ইনস্পেক্টর বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। আমার তখন যাহা অবস্থা হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই বর্ণনাতীত। আমার চক্ষে জল আসিতেছিল।

সতীশের গাত্রবস্ত্র অনুসন্ধানের ফলেও দুইটি দেশলাই, আর একটি পকেট ল্যাম্প ও সেই চামড়ার কেসে রক্ষিত ক্ষুদ্র পিস্তলটি পর মুহূর্ত্তেই আবিষ্কৃত হইল।

ইনস্পেক্টার বাবু ললিত ও শরৎ উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে খুব বাহাদুরী আছে তোমাদের। এই দেখ, কি সব জিনিষপত্র মহাপুরুষদের কাছ থেকে বেরুল।"

ললিত ও শরৎ তাহা দেখিয়া বিস্ময়সূচক ধ্বনি উচ্চারণ করিল।

আমি তখন অতি কষ্টে বলিলাম, "মশাই, আমরা কলকাতা থেকে আজ সকালে এসেছি মাত্র। আমরা কিছুই জানি না।

আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইনস্পেক্টার বাবু হুকুম দিলেন, "লে যাও।"

উভয়েই সে রাত্রে হাজতগৃহে যে কি সুখে অতিবাহিত করিলাম তাহার বর্ণনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে দেবলরাজার গুপ্ত ধনাগারের অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি লাভ করিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হইবার সুখস্বপ্ন তখন একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

প্রভাতেই আবার থানার অফিসঘরে নীত হইলাম। ললিত ও শরৎ দুজনেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। ঘরের এককোণে দেখিলাম, একখানি টুলের উপর পূর্ব্বদিনের সেই বৃদ্ধ বসিয়া আছেন।

বলিদানের ছাগশিশুর ন্যায় আমার তখন কম্প ধরিয়াছিল।

ইনস্পেক্টর বাবু আসিয়া সকলের এজেহার লইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই সেই বৃদ্ধের ডাক হইল।

তিনি আসিয়া একবার সভয়ে আমাদের দিকে চাহিলেন। তার পর হস্তদ্বয় জোড় করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মবতার, বিচারপতি! আমি এ বিষয়ের কিছুই জানিনে। কাল দুপুর বেলা আমি আমার কলাবাগান থেকে আসছিলাম, পথে বাবু দুটির সঙ্গে দেখা হল। ওঁরা তো হুজুর, আমাকে দেখেই পাশ কাটাবার চেষ্টা কত্তে লাগলেন, আমিই ডেকে নামধাম জিজ্ঞাসা কল্লাম। কি নাম, কোথায় যাওয়া হবে, কোথা থেকে আসা হচ্ছে, এই রকম পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্ত্তেই বাবুরা তো চটে লাল, তার পর বল্লেন আমরা শীকার কত্তে এসেছি। ষ্টেশনে আমাদের লোকজন,তাঁবু, হাতী,ঘোড়া,শিকারী সব রয়েছে। তার পর বাড়ীতে এসে ধর্ম্মাবতার, সেই গল্প কচ্ছিলাম, এমন সময় আমার মেজ নাতিটী বায়না নিলে যে 'দাদু হাতী দেখবো।' কিছুতেই শোনে না, তখন কি করি হুজুর, এই বুড়ো মানুষ, সেই রোদ্দুরে চল্লাম আবার নাতিটীকে নিয়ে

ইষ্টিশান মুখো। গিয়ে দেখি, ও হরি! কোথাও কিছু নেই, সব ভোঁ ভাঁ। মাষ্টার বাবুকে জিজ্ঞাসা কল্লাম, 'হ্যাঁ মশাই, শিকারী বাবুদের হাতী ঘোড়া লোকলস্কর সব কোথায়?' তিনি তো হুজুর শুনে অবাক। তখন আমি ব্যাপারখানা সব বল্লাম। দারোগাবাবুরাও তখন সেখানে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। ওঁরা হুঁকো রেখে তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে এলেন। নাতিটাকে বাড়ীর পথে দিয়ে তার পর অনেক খুঁজেপেতে ধর্ম্মাবতার, ওঁরা ধরা পড়েছেন। কি সর্ব্বনেশে কথা, ভদ্রলোকের ছেলেরা কি না শেষে ডাকাতী ব্যবসা ধরেছে। কলি এইবার উল্টোবে হুজুর!"

বৃদ্ধের এই বক্তৃতা এবং তদীয় পৌত্রের হস্তীদর্শনের ইচ্ছাঘটিত ব্যাপার শুনিয়া আমার তো প্রাণ উড়িয়া গেল। এখন বুঝিলাম দারোগাদ্বয় কি বিশেষ প্রমাণ পাইয়া আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

ললিত ও শরৎবাবু উভয়েই বৃদ্ধের কথা সমর্থন করিলেন এবং কি উপায়ে আমরা সেই গুপ্তগৃহে ধৃত হইয়াছি তাহাও বলিলেন।

'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।'—সুতরাং ইনস্‌পেক্টার বাবুও আমাদের নিকট প্রাপ্ত ছোরা, পিস্তল, পকেটল্যাম্প প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া নিজের মন্তব্যসহ জানাইলেন যে গাংনাপুর, রাণাঘাট, বনগ্রাম প্রভৃতি স্থানের সান্নিধ্যে ডাকাতী করিবার অভিযোগে আমাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সতীশ বলিল, "কিন্তু মশাই, আমরা কাল সকালের চাঁদপুর মেলে কলিকাতা থেকে এসেছিলাম।"

"কি উদ্দেশ্যে?"

সে চুপ করিয়া রহিল। আমি অনন্যোপায় হইয়া দেবলরাজা ঘটিত সমস্ত কথাই বলিলাম। শুনিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

আবার প্রশ্ন হইল, "চাঁদপুর মেলে এসে কি কল্লেন?"

আমিই তাহার উত্তর দিলাম। বলিলাম, "ষ্টেশনে নেমে, স্নান করে, সাড়ে দশটার ট্রেণে গাংনাপুর গিয়েছিলাম। হোটেলে খেয়ে তার পর—"

প্রশ্ন হইল, "কোন হোটেলে খেয়েছিলেন?"

হোটেলের নাম বলিলাম। পরের ট্রেণে, গাংনাপুর হোটেল হইতে খাতা আনিবার জন্য একজন কনেষ্টবল ছুটিল।

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। হায়, হায়! অতি-সাবধানতার ফলে আমরা হোটেলের খাতায় কাল্পনিক নামধাম লেখাইয়াছি। বুঝিলাম অদৃষ্টে এখনও অনেক দুর্গতি আছে।

অপরাহ্নের পূর্ব্বেই হোটেলওয়ালা স্বয়ং খাতা লইয়া থানায় আসিয়া, ললিতবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ইনস্পেক্টার বাবু প্রভৃতি প্রত্যেককেই আভূমি এক একটী সেলাম করিল।

যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। খাতায় আমাদের নাম বাহির হইল না।

ললিতবাবু বলিলেন, কৈ মশাই, আপনাদের নাম তো পাওয়া গেল না?"

সতীশ তখন বলিল যে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই আমরা নামধাম বলি নাই।

শুনিয়া ইনস্পেক্টরের মুখ গম্ভীর হইল। পরক্ষণেই তিনি বলিলেন, "আপনাদের কথা বিশ্বাস কল্লাম না মশাই।"

তখন আমরা হোটেলওয়ালাকে দিয়া আমাদের সনাক্ত করাইলাম। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি বলিলেন, "হোটেলওয়ালা না হয় স্বীকার কচ্ছে যে ওদের হোটেলে আপনারা খেয়েছিলেন। কিন্তু

তাই বলে যে আপনাদের মনে কোন অসৎ অভিপ্রায় ছিল না, তা তো এ ব্যক্তি বল্‌তে পারে না।”

হোটেলওয়ালা তৎক্ষণাৎ সেই কথা লুফিয়া লইয়া বলিল—“আজ্ঞে তা কি করে জানবো ধর্ম্মাবতার, কার মনে কি আছে না আছে, কে বলতে পারে!”

ললিত ও শরতের সহিত পরামর্শ করিয়া ইনস্‌পেক্টর বাবু বলিতে লাগিলেন, “মশাই, যাই বলুন, যতক্ষণ সন্তোষজনক প্রমাণ না দিতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ আমি কিছুতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পার্ব্ব না যে আপনারা নির্দ্দোষী। রাজার টাকার ঘর আবিষ্কার কর্ত্তে গিয়েছিলেন, সে কথা বলে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের ভুলিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু আমরা পুলিসের লোক, আমরা ও সব ফাঁকা কথায় ভুলবো না। এক যদি প্রমাণ দেখাতে পারেন যে, যে সকল ডাকাতীর জন্যে আপনাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার সঙ্গে আপনারা সংশ্লিষ্ট নন, আর, কাল দেব-গ্রামের ভাঙ্গাঘরে কি কচ্ছিলেন, এই সব আমাদের বুঝিয়ে দেন, আপ-নাদের ছেড়ে দিচ্ছি। তা না হলে—উহুঁ—”বলিয়াই একখণ্ড কাগজে তিনি কি লিখিতে বসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বুঝিলাম উদ্ধারের আশা অতি অল্প। সেই সময় হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় একটা কথা আমার মনে উদিত হইল। ইনস্‌পেক্টরকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম, “মশাই আমি গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট, আপনাকে যদি একটা অনুরোধ করি, তা হলে দয়া করে শুনবেন?”

তিনি আমাদের দিকে চাহিলেন। সতীশও জিজ্ঞাসাকুল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

আমি বলিলাম, "মশাই, কলকাতার বাইরে আমি বড় একটা কোথাও যাই না। আপনি অনুগ্রহ করে আমার আফিসের 'এটেনডান্স রেজিষ্টার' আনিয়ে দেখুন, তাতে দেখবেন যে আমি বরাবর কলকাতাতেই আছি। ডাকাতী ফাকাতী কল্লাম কবে ?"

লেখা বন্ধ করিয়া তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "তা, সমস্ত দিন আফিসে কাজ করে, সন্ধ্যার ট্রেণে রাণাঘাটে এসে, দলবল নিয়ে ডাকাতী করে, তার পর দিন দশটার সময় আফিস করা কিছু আশ্চর্য্য নয়। ভদ্রলোকের ছেলে, যাদের ডাকাতী করবার সাহস আছে, তারা এ কাজও অনায়াসেই পারে।"

এ কথার কি উত্তর দিব ? ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলাম। চক্ষু দিয়া জল পড়িবার উপক্রম হইল।

সতীশকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোন বক্তব্য আছে ?"

সতীশ একবার আমার দিকে চাহিল, তারপর আমাকে বলিল, "রমেশ, তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে, না ?"

আমি তাহার কথার কোন উত্তর দিলাম না। রাগে, ক্ষোভে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। অদৃষ্টকে সহস্রবার ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

সতীশ ইনস্পেক্টর বাবুকে বলিল, "আমরা যে নির্দ্দোষী, তার প্রমাণ আপনাকে আমি দিতে পারি।"

"কি রকমে ?"

সতীশ বলিল, "আমাকে যদি একখানা টেলিগ্রামের ফরম অনুগ্রহ করে দেন, তা হলে আমি কলকাতায় একখানা টেলিগ্রাম করি।

"কাকে টেলিগ্রাম করবেন ?

সতীশ বলিল, "ইনস্পেক্টর জেনারল অফ্ পুলিসকে।"

ইনস্পেক্টর চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিলেন। বলিলেন, "তার মানে?"

সতীশ বলিল, "ফলেন পরিচীয়তে।"

ইনস্পেক্টর বাবু দেরাজের ভিতর হইতে একখানি টেলিগ্রামের ফরম বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমি কিন্তু টেলিগ্রামখানি দেখবো।"

"স্বচ্ছন্দে।"

একটি পেন্সিল লইয়া সতীশ ফরমখানিতে কি লিখিল। তাহা দেখিবার কৌতূহল আমার কিছুমাত্র ছিল না, হতভাগাটার উপর আমি হাড়ে চটিয়াছিলাম।

দারোগাবাবু পুনরায় আমাদিগকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিলেন।

পরদিন আবার থানার অফিসঘরে নীত হইলাম। দেখিলাম, ইনস্‌পেক্টর বাবু, ললিত ও শরৎ তিনজনেই সেখানে বসিয়া আছেন। ইনস্‌পেক্টার বাবু বলিলেন, "আপনার টেলিগ্রামের উত্তর এসেছে।"

ব্যস্তভাবে সতীশ বলিল, "কৈ দেখি?"

তিনি লেফাফাসমেত টেলিগ্রামখানি দিলেন। সতীশ তাহা পড়িয়া মৃদু হাস্যের সহিত আমাকে দিল। আমি পড়িয়া যথেষ্ট বিস্মিত হইলাম।

স্বয়ং ইনস্‌পেক্টর জেনার্‌ল অফ্ পুলিস সতীশকে পত্রপাঠ মুক্তি দিবার জন্য রাণাঘাট থানার ইনেস্‌পেক্টরকে অনুরোধ করিতেছেন, ইহাই টেলিগ্রামখানির মর্ম্ম। কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম দারোগাত্রয়ও যথেষ্ট বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। ইনস্পেক্টর বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার খানা কি?"

সতীশ বলিল, "কিসের?"

"এই টেলিগ্রামের ?"

সতীশ বলিল, "আমি যে ডাকাত বা তাদের সংশ্লিষ্ট কোন লোক নই, তার প্রমাণ তো পেলেন, এখন ছেড়ে দিন আমাদের।"

দারোগা বাবু বলিলেন, "তা তো দিচ্ছি ছেড়ে, কিন্তু কাণ্ডখানা কি বুঝতে পাল্লাম না যে। কে আপনি ?"

সতীশ একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিল, "আমি আপনাদেরই দলের লোক। আমি সি, আই, ডি।"

আমিও চমকিয়া উঠিলাম। সতীশ বলে কি ? সে সি-আই-ডিপার্ট-মেণ্টের লোক, অথচ আমি তাহা জানি না! তাহার কথা বিশ্বাস করিলাম না।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবগ্রামে গিয়েছিলেন কি কর্ত্তে ?"

সতীশ জানাইল যে উক্ত অঞ্চলে উপর্য্যুপরি কয়েকটি ডাকাতী হইয়া গেল, অথচ স্থানীয় পুলিস তাহার কিছু কিনারা করিতে পারিল না, ইহাতে কলিকাতায় ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অতি গোপনে ঐ সকল স্থলে অনুসন্ধান করিতে বলেন। কিন্তু আসিবার পূর্ব্বে সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে তাহার গোপন অনুসন্ধান এইরূপ প্রহসনে পরিণত হইবে।

ইনসপেক্টার বাবু হাসিয়া উঠিলেন। ললিত ও শরৎ বাবুদ্বয় তখন একসঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে তো বড়ই অভদ্রতা করেছি মশায়ের সঙ্গে আমরা! যখন ধরেছিলাম, তখনই যদি বলতেন যে আপনিও আমাদের সঙ্গে—একই গোঠের—ওর নাম কি—"

সতীশ বলিল, "বল্লে কি আপনারা বিশ্বাস করতেন মশাই ? মনে করতেন, মিছে করে—"

ললিত বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ,—তা—বটে।"

ইনস্‌পেক্টর বাবু আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি ?"

সতীশ একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। আমাকেও বসিতে বলিল। আমিও বসিলাম, কিন্তু ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গিয়াছিল, মনে হইতেছিল যেন আবুহোসেনের অভিনয় দেখিতেছি।

সতীশ বলিল, "সমস্ত প্রহসনটার মধ্যে ঐ খানটাই 'সিরিয়স্‌'। বড় সাহেবের হুকুম পেয়েই আমি একদিন দেবগ্রামে এসে ঐ সব জায়গাগুলো দেখে শুনে গিয়েছিলাম। তারপর ভেবে চিন্তে স্থির কল্লাম যে নেহাৎ একলা না এসে, আমার এই ভালমানুষ বন্ধুটীকে নিয়ে আসি। তাই ওঁকে অনেক ভূপিয়ে এনেছিলাম, কিন্তু শেষটা এমন গড়াবে জানলে কি আর ভদ্রলোককে অনর্থক কষ্ট দিতাম !"—বলিয়া সতীশ আমার নিকট দেবলরাজা ও তাঁহার গুপ্তধনাগার সম্বন্ধে যতগুলি মিথ্যাকথা বলিয়াছিল, তজ্জন্য অতি বিনীতভাবে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "পরিচয়টা গাংনাপুরের ষ্টেশনে দিলেই তো হোত !"

সে বলিল যে আমার ন্যায় বৃহৎ মৎস্য তুলিতে হইলে একটু খেলাইয়া তুলিতে হয়। হতভাগাটা এইরূপে হয়রাণ করিয়া শেষে কিনা আমাকে আবার মৎস্যের সহিত তুলনা করিল !

ইনস্‌পেক্টার বাবু বলিলেন, "ভাগ্যে এখনও কৃষ্ণনগরে সাহেবকে টেলিগ্রাম করে ডাকাত ধরার খবর জানাই নি।"

* * * * *

প্রাতে হাজতগৃহে অৰ্দ্ধদগ্ধ রুটি এবং কদর্য্য মূলার তরকারী নামমাত্র আহার করিয়া ক্ষুধায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় ইনস্‌-পেক্টার বাবুর বাসায় চর্ব্ব্য, চোষ্য প্রভৃতি অতি পরিপাটীভাবে ভোজন করতঃ ইনস্‌পেক্টার বাবু, ললিত, শরৎ এমন কি সেই কনেষ্টবলদ্বয়ের

বহুবিধ ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে প্রত্যুষের গোয়ালন্দ মেলে আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। সতীশ সেইখানেই রহিল।

সতীশের অনুরোধমতে যাইবার পূর্ব্বে আমার স্ত্রীকেও দেবলরাজার ধনাগার ঘটিত কোন কথাই বলি নাই। তিনি এই ব্যাপার আগাগোড়া শুনিয়া, আমা অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট হইয়াও,—এমন কি সম্পর্কে আমার স্ত্রী হইয়াও—আমার বুদ্ধিবৃত্তির সহিত রজকালয়ের চতুষ্পদ-বিশেষের তুলনা করিলেন।

ভাগ্যবিপর্য্যয়

[১]

অগ্রহায়ণ মাস হইলে কি হয়, শীতের প্রকোপটা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং যখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম তখন সবিস্ময়ে ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখি ৭॥০ টা বাজিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, ৭॥০ টার সময় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া দোকান খুলিব কখন ?

গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের নূতনবাজারে আমার দোকান। সব রকম কারবারই আমি করিয়া থাকি। ঈশ্বরেচ্ছায় দোকানটির হীনাবস্থা হইতে এখন যে অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছি, তাহাতে শত্রু ছাড়া সকলেই, বিশেষতঃ মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিত যে, বাজারের মধ্যে আমার দোকানখানিই নম্বর ওয়ান অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাক্, নিজের কথা ঢোল বাজাইয়া, পাঠকবর্গের কাণে তালা লাগান আমার অভিপ্রায় নহে।

যেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন ২৪শে অগ্রহায়ণ। শীতটা বেশ পড়িয়াছিল। শয্যাত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক দোকান খুলিতেই প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। দোকানে ধূনা-গঙ্গাজল ছিটাইয়া বালাপোষখানি মুড়ি দিয়া সবেমাত্র তক্তপোষের উপর বসিয়াছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স বড় বেশী নয়, জোর চব্বিশ কি পঁচিশ। পায়ে ফুল ইষ্টকিনের উপর বাদামী রঙের একজোড়া জুতা, গায়ে কাল কোট, মাথায় একখানি শাল ভাঁজ করিয়া জড়ানো। মুখের বর্ণ ঘনশ্যাম, গাল দুটি কামানো, কেবল চিবুক ঢাকিয়া

ত্রিকোণাকার দাড়ী—মজুমদার মহাশয়ের পুত্র বলে, তাহাকে নাকি, ফ্রেঞ্চ দাড়ী বলে। লোকটার হাতে একটি ব্যাগ ঝুলিতেছিল।

খাতায় তখনও দশবার দুর্গা নাম লেখা হয় নাই, এরূপ সময়ে সহসা এমন এক ভদ্রলোকের আবির্ভাবে একটু ব্যতিব্যস্ত হইলাম বৈ কি। তাড়াতাড়ি তক্তপোষের উপর হইতে আমার খাতাপত্র বাক্স প্রভৃতি সরাইয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি অভিপ্রায়ে আসা হয়েছে ?"

ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন—"মশাই, এতবড় বাজারটার মধ্যে আপনি হচ্ছেন একজন সম্ভ্রান্ত দোকানদার। তা, আপনার কাছেই আমার একটা বলবার কথা আছে। সম্প্রতি আমরা একটা সোসাইটী স্থাপন করেছি, তার নাম—"

এই কথা বলিয়া ভদ্রলোকটি খুব লম্বাচওড়া একটা ইংরাজি নাম বলিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ নামটি ভুলিয়া গিয়াছি।

যাহা হউক, এই সোসাইটী বা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য এই যে, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে অনাথা বিধবাগণ দারিদ্র্যে কালযাপন করিতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করা, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিবর্গকে আহার্য্য প্রদান, ইত্যাদি ইত্যাদি—

এই সমস্ত বক্তৃতা শুনিয়া আমি বলিলাম, মশায়, "আপনারা যে এত সৎকার্য্য করেন, টাকা দেয় কে ?"

তিনি বলিলেন, "এই যে সেই কথাই হচ্ছে।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার হস্তস্থিত ব্যাগ খুলিয়া একখানি ছাপান কাগজ আমাকে দিলেন। তাহার বাঙ্গালার অংশের নকল নিম্নে দিলাম।

হৈ হৈ কাণ্ড! রৈ রৈ ব্যাপার!!

ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মাহেন্দ্রযোগ!

এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না!!!

বিনামূল্যে হাজার মণ চাউল!!!!

"এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমরা কতিপয় শিক্ষিত যুবক সমবেত হইয়া কুষ্ঠিয়ায় একটি সমিতি খুলিয়াছি, তাহার নাম (ইংরাজিতে কতকগুলা কি লেখা আছে, পড়িতে পারিলাম না)

"উক্ত সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য এই যে, যেখানে অনাথ, আতুর, পঙ্গু, অন্ধ, জরাগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণ উপযুক্ত সাহায্যাভাবে করাল কালকবলিত হইতেছে, সেইস্থানে যথোপযুক্ত সাহায্যদ্বারা তাহাদের কষ্ট দূর করা। এবম্প্রকারের কত শতসহস্র সদনুষ্ঠান এই সমিতি কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাহুল্যভয়ে রাজামহারাজাগণের প্রশংসাপত্র উদ্ধৃত করা হইল না।

"এক্ষণে জনসাধারণের হিতকল্পে আমরা এক অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অনন্নুমেয় বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠানকল্পে যত্নবান হইয়াছি। বলা আবশ্যক, এ সুযোগ একমাসের অধিক স্থায়ী হইবে না।

"আমাদের সৎকার্য্যের বহুলপ্রচারকল্পে আমরা একপ্রকার কুপন বাহির করিয়াছি। প্রত্যেক কুপনের মূল্য অতি সামান্য—চারি আনা মাত্র। আগামী ৪ঠা মার্চ্চ মঙ্গলবার সেই কুপনের লটারি হইবে। পাঁচজন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।—

পুরস্কারের তালিকা—

১ম পুরস্কার—হাজার মণ চাউল।

২য় "—পাঁচশত " "

৩য় "—তিনশত " "

৪র্থ "—দুইশত " "

৫ম "—একশত " "

কুপন বিক্রয়লব্ধ অবশিষ্ট টাকা উল্লিখিত সৎকার্য্যে ব্যয় করা হইবে। বলুন দেখি, ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মাহেন্দ্রযোগ কি না! ইতি

কুষ্টিয়া ওয়াই, সি রায়,

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। অনারারী সেক্রেটারী।

পুঃ—লটারিতে যাঁহাদের নাম উঠিবে তাঁহারা শীঘ্র যাহাতে পুরস্কার-লব্ধ চাউল পাইতে পারেন, তজ্জন্য অত্রস্থ কোন বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ীর সহিত সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইতি সেক্রেটারী"

* * * *

কাগজখানা পড়িয়াই আমি তো অবাক্। ভাবিলাম, যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে সে ব্যক্তি চারি আনায় হাজার মণ চাউল পাইবে। ইহাপেক্ষা অধিকতর সুযোগ যে, পৃথিবীতে হইতে পারে, ইহা অসম্ভব মনে হয়। ভগবান সোসাইটিকে দীর্ঘজীবী করুন। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

ভদ্রলোকটি বলিলেন "দেখুন মশায়, আপনাদের মত লোকের ভরসাতেই এরূপ স্থলে আসা। এতবড় একটা জনহিতকর কার্য্যে যদি আপনাদের মত লোকে আমাদের উৎসাহ না দেন, তা হলে আমাদের এ সঙ্কল্প কতদিন টিক্‌বে। এক রাণাঘাটেই কা'ল প্রায় ৫০০ টিকিট

বিক্রী হয়েছে। সর্ব্বত্রই আমাদের কাজের প্রশংসা হচ্ছে। গত সপ্তাহে 'বেঙ্গলীতে' আমাদের সোসাইটীর যে কত প্রশংসা বেরিয়েছে, তা আর কি বলব, এই যে দেখুন না।"

এই বলিয়া বাবুটি কিয়ৎকাল ব্যাগটির মধ্যে খুঁজিলেন, কিন্তু উভয়েরই দুর্ভাগ্যবশতঃ 'বেঙ্গলী' মিলিল না। তিনি তখন বলিলেন "এহে ফেলে এসেছি বোধ হয়। মশাই, বলবো কি, সে দুটি কলম একেবারে ভর্ত্তি। তা যাক্ এখন আমাদের কাজের তত্ত্বটা বুঝেছেন তো? তা মশাই, এত বড় ব্যাপারটায় অন্ততঃ চার গণ্ডা পয়সা দিয়েও আপনার সাহায্য কর্ত্তে হবে। বেশী না পারেন, অন্ততঃ একখানি টিকিটও আপনাকে কিনতেই হবে।"

আমি ভাবিলাম মন্দ কি? চারি আনার টিকিট কিনিলে, যদি অদৃষ্টে থাকে তাহা হইলে বড়মানুষ হইব, আর না হয় ।৹ আনা ক্ষতিই হইবে। সুতরাং ক্ষতির পরিমাণও তেমন বেশী নয়। সাতপাঁচ ভাবিয়া আমার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র শ্যামাপদর নামে একখানা টিকিট কিনিলাম।

দেখা-দেখি মতি ময়রা, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ প্রভৃতি আরও সাত আট জন লোক একখানি করিয়া টিকিট কিনিল। ভদ্রলোকটি ব্যাগ লইয়া অল্পক্ষণ পরেই চলিয়া গেলেন।

[২]

দুই মাস আর কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না। ভাবিলাম, লোকটা ।৹ আনা লইয়া পলাইল না ত? রাসু ঘোষ ময়দা কিনিতে আসিয়া বলিল, "কালীপদ, হাজার মণ চালের কি হচ্ছে?" রামসর্ব্বস্ব মিত্র আসিয়া বলিল "কালীপদ, গুদাম ভাড়া করলে কই, চাল রাখবে

কোথা ?" এইরূপে অনেকেই বিদ্রূপ করিতে লাগিল, আমি কথা কহিলাম না। ভাবিলাম কি বিপদেই পড়িয়াছি।

ক্রমে আরও একমাস গেল। অবশেষে ২২শে ফাল্গুন (তারিখ বেশ মনে আছে) বৃহস্পতিবার বেলা ৮টার সময় এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির। মজুমদার মহাশয়ের পুত্র সেইখানে বসিয়াছিল। তাহাকে দিয়া টেলিগ্রাম পড়াইলাম।

টেলিগ্রাম পড়িয়া সে বলিল—"কি খাওয়াচ্ছ বল ?"

আমি বলিলাম—"কেন ? ব্যাপার কি ? কোথাকার তার ?"

সে বলিল—"কুষ্টিয়া থেকে। শ্যামাপদর নামে এসেছে। লিখেছে, তুমি ফ্রাষ্ট-প্রাইজ পেয়েছ, চিঠি যাচ্ছে।"

আমি বসিয়াছিলাম, এক লম্ফে তক্তপোষ হইতে নীচে নামিলাম। তখনকার সে আনন্দ লিখিয়া বুঝাইবার নহে। পাশের দোকানদারদিগকে সংবাদটা দিলাম। কেহ বা আহ্লাদ প্রকাশ করিল, কেহ বা বিদ্রূপ করিল। যে পিয়ন টেলিগ্রাম আনিয়াছিল, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নগদ ১৲ টাকা দিয়া বিদায় করিলাম।

আমার অন্তঃপুরেও হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আমার কন্যা ইতিপূর্ব্বে একছড়া সোনার নেকলেস গড়াইতে বলিয়াছিল, সে এখন সোণা ছাড়িয়া জড়োয়ার বায়না ধরিল। আমার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র শ্যামাপদ, তাহারই নামে টিকিট কিনিয়াছিলাম, সে নূতন ধুতি, নূতন জামা, নূতন জুতা পরিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গেল। ৺আনন্দময়ীর মন্দিরে মহাসমারোহে ছাগবলি হইল। রাত্রে ৺সত্যনারায়ণের সিন্নী হইল। সমগ্র গোয়াড়ীতে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। সকলেই কাণাকাণি করিতে লাগিল যে, কালীপদ ঘোষ

বড়মানুষ হইয়াছে। হাজার মণ চাউলের মূল্য খুব কম করিয়া ধরিলেও ৫০০০৲ টাকা। রাতারাতি বড়মানুষ হওয়া আর কাহাকে বলে ?

মতি ময়রা, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ প্রভৃতি আর আর যাহারা টিকিট কিনিয়াছিল, তাহারা শুষ্কমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আর ভাই, তোমারই বরাত খুল্‌লো ; আমরাও তো টিকিট কিনেছিলাম, কৈ কিছুই তো হোল না। বরাত ভাই, সবই বরাত ! তা একদিন আমাদের বাজারশুদ্ধ একটি মস্ত ভোজ দিতে হবে কিন্তু।" আমি সানন্দে বলিলাম—"তা দেবো বৈ কি। তা আর দেবো না ?"

পরদিন প্রাতে পত্র আসিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"নমস্কার নিবেদন,

এতদ্বারা মহাশয়কে আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার নামে হাজার মণ চাউল লটারিতে উঠিয়াছে। তাহা ৫০০ বস্তায় প্যাকবন্দী করিয়া মালগাড়ীতে এখান হইতে পাঠান হইল। রসিদ ভিঃ পিতে পাঠাইলাম। পত্রপাঠমাত্র নিম্নলিখিত সরঞ্জামী খরচ পোষ্টাফিসে জমা দিয়া ভিঃ পি লইবেন। তাহাতে রেলের রসিদ আছে। পরে ষ্টেশনে মাল পৌঁছিলে উক্ত রসিদ দাখিল করিয়া ডেলিভারি লইবেন। বেশী দেরী করিবেন না, কারণ তাহা হইলে ডিমারেজ লাগিবে। জ্ঞাতার্থে নিবেদন ইতি, তারিখ ২২শে ফাল্গুন ১৩১৯—

ওয়াই, সি রায়।

অনারারী সেক্রেটারী—

খরচের তালিকা যথা—

৫০০ খানি থলিয়ার মূল্য, ।০ হিসাবে—১২৫৲

প্যাকিং খরচ ৲১০ হিসাবে————১৫৷৵০

কুলীভাড়া ৲১০ হিসাবে— ১৫৷৵০

ছুঁচ, দড়ি, কালি ইত্যাদি বাবদে— ১৲

আফিস হইতে ষ্টেশনে মাল লইয়া যাইবার জন্ম গরুরগাড়ী ভাড়া ।০ হিসাবে ৫০ খানি গরুর গাড়ী } ১২৷০

রেলের ভাড়া— ৯৩৸০

ভিঃ পিঃ খরচা— ৩৲

বাজেখরচ— ৩৷০

একুন ২৭০৲ টাকা

মঃ দুই শত সত্তর টাকা মাত্র—"

চিঠিখানি খুলিবার সময় যতটা আনন্দে অধীর হইয়া খুলিয়াছিলাম, এখন কিন্তু আর সে আনন্দ রহিল না। ভাবিলাম তাই তো! ২৭০৲ টাকা আবার এখনি দিতে হইবে! ভিঃ পি লইব কি ফিরাইয়া দিব ভাবিতে লাগিলাম। রামসর্ব্বস্ব মিত্র আসিলেন। তাঁহাকে চিঠিখানি দেখাইলাম, তিনি বলিলেন—"সত্যি কথাই তো! হাজার মণ চাল তোমার নামে উঠেছে, ।০ আনায় হাজার মণ চাল পাচ্ছ, তাই তারা দিচ্ছে, সেই তোমার ভাগ্যি বলতে হবে। তার উপর রেলের খরচ, মোটের দাম, এ সব তারা আর ধরবে না? তারা তো আর দানছত্র খুলে বসেনি যে রেলের খরচা ঘর থেকে দিয়ে তোমার দোকানে চালের বস্তা সাজিয়ে ভাত রেঁধে খাইয়ে যাবে। অন্যায় কথা বল্লে হবে কেন বাপু?"

আমিও তাহাই বুঝিলাম। তারপর বলিলাম, "আচ্ছা আমাকে তো লিখ্‌লেই আমি নিজে গিয়ে চাউল আনার বন্দোবস্ত কর্ত্তে পার্ত্তাম। তারা ঘরের কড়ি খরচ করে পাঠাতে যায় কেন?"

"ভারি অন্যায় কাজ করেছে তারা! ছাঁপোষা দোকানদার মানুষ তুমি, তোমায় এই শীতে কুষ্ঠে পর্য্যন্ত না ছুটিয়ে তারা নিজে সব বন্দোবস্ত করে কেবল নায্য খরচটি তোমার কাছে চেয়েছে এই তাদের অন্যায়। তুমি গেলে রেলকোম্পানী তো তোমার চেহারা দেখে অমনি মাল বয়ে দিত না?"

এ কথার উপর আর কি তর্ক করিব, কাজেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মিত্র মহাশয় নিজের কাজ সারিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে ভিঃ পি লওয়াই স্থির করিলাম।

পরদিন ভিঃ পি আসিল। হাতে কেবল ১০০৲ টাকা তখন ছিল। ঋণ করিয়া বাকী ১৭০৲ টাকা সংগ্রহ করিলাম। শ্রীদুর্গা বলিয়া ২৭০৲ টাকা পোষ্টাফিসে জমা দিয়া ভিঃ পি লইলাম। খুলিয়া দেখিলাম যে যথার্থই তাহার মধ্যে রেলের রসিদ আছে বটে। পোষ্টমাষ্টার বাবুকে দেখাইলাম; তিনি বলিলেন, "পাঁচশ বোরা চাউল, ওজন ১০০০ মণ।" তখন আশ্বস্ত হইলাম। মনের আনন্দ ও চাঞ্চল্য আবার ফিরিয়া আসিল।

ষ্টেশনে খবর লইয়া জানিলাম, তখনও মাল আসে নাই। বুকিং-ক্লার্ক বাবু বলিলেন—"মালগাড়ীর জিনিষ প্রায়ই দেরীতে এসে পৌছোয়। হাজার মণ চাউল, সে তো দুখানা ওয়াগন্ বোঝাই হয়ে আসবে। সে কি আর চাপা থাক্‌বে? এলেই টের পাবেন এখন। কোথা থেকে আসছে বল্লেন—কুষ্ঠে থেকে বুঝি?"

পরদিন ষ্টেশনের একজন কুলী আমার দোকানে ময়দা কিনিতে আসিয়া আমাকে খবর দিল "বাবু, আপ্‌কো মাল আ গিয়া।"

আমার তখন আনন্দ দেখে কে? তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে ছুটিলাম। বুকিংক্লার্ক বাবুকে বলিলাম, "কি মশাই, এসেছে নাকি?"

তিনি বলিলেন "হ্যাঁ, কিন্তু সে তো চা'ল নয়।"

বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল; কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল; বাক্য লোপ পাইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে বলিলাম, "তবে কি?"

"একমোট সুপুরি, কুষ্টিয়া থেকে এসেছে।"

"সুপুরি,—কুষ্টিয়া থেকে? সুপুরি কে পাঠাবে মশাই? আপনার ভুল হয়নি তো?"

"ভুল কি রকম? এই দেখুন না কেন, চালানে স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'বিটিল নাট',। আপনি কি বলতে চান যে বিটিল নাট মানে চাল?"

আমি বলিলাম—"বিটিল নাট মানে চ'াল কি ডাল, তা ত আমি জানিনে মশাই—মালটা কৈ দেখ্‌লেই ত বোঝা যাবে।"

সঙ্গে করিয়া বাবুটী আমাকে গুদামে লইয়া গিয়া মুখবন্ধ থলি দেখাইয়া দিলেন। টিপিয়া, নাড়িয়া দেখিলাম—সুপারি বলিয়াই বোধ হইল।

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমার রসিদে যে লেখা, চাউল ৫০০ খানা বস্তা।"

তিনি বলিলেন, "দেখি আপনার রসিদটা।"

আমি দেখাইলাম। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কি মশাই, এ যে একই নম্বর। কি রকম হল? একই রসিদ, একই সই, সব সমান; কেবল আমাদের রসিদে লেখা এক বোরা সুপারি, আপনার রসিদে লেখা ৫০০ বোরা চাউল। এ মশাই, এর মধ্যে একটা ভয়ানক গোলযোগের

ব্যাপার আছে। আপনি এই বেলা পুলিসে খবর দিন। আজ তো রবিবার, ডেলিভারি হবে না।"

শুনিয়া, চোখে সর্ষেফুল দেখিলাম। পৃথিবী যে ঘোরে, এ কথা ইংরাজীওয়ালাদের মুখে অনেকদিন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম না; এখন তাহা বিশ্বাস করিলাম।

[৩]

ষ্টেশন হইতে থানা প্রায় এক মাইল দূরে। সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সেখানে চলিলাম। থানার একজন সবইনেস্‌পেক্টার বাবু আমার পরিচিত ছিলেন; ঘটনাক্রমে তাঁহার সাক্ষাতও পাইলাম। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি বলিলেন "তাই তো কালীপদ বাবু, শেষটা এমনি করে সব গুলিয়ে ফেল্লেন। আচ্ছা, আমি সব ডায়ারি করে নিচ্ছি; আপনি বরং এক কাজ করুন না কেন?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি?"

তিনি বলিলেন "এক কাজ করুন। আজ তো রবিবার। আপনি কা'ল ভিঃ পি নিয়েছেন, সুতরাং টাকা কিছু আজ আর সেখানে ডেলিভারি হবে না। আপনি এখনই কুষ্টিয়ায় চলে যান। গিয়ে ভাল করে সন্ধানটা নিন। খুব গোপনে সন্ধান নেবেন, বুঝলেন? যদি তেমন সন্ধান কিছু পান, তখনিই আমায় একখানি আরজেণ্ট টেলিগ্রাম করে দেবেন। আর সব যা করতে হয়, আমি করব এখন। মোট কথা, আর দেরী করবেন না, বুঝলেন?"

বুদ্ধিভ্রংশ হইলে লোকে যেমন বুঝিয়া থাকে, আমিও সেইরূপই বুঝিলাম। সেই রৌদ্রে আবার বাড়ী ফিরিলাম। সমস্ত দিন স্নান-আহার হয় নাই। নিতান্ত বিষণ্নমনে সে কার্য্য সমাধা করিলাম।

ভাবিলাম, জগতের কি বিচিত্রগতি! কোথায় চারি আনায় হাজার মণ চাউল পাইবার আশা করিতেছিলাম, আর কোথায় ২৭০৲ টাকা জলে দিয়া তাহার উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা! কোথায় আশার সুবর্ণসৌধ নির্ম্মাণ করিতেছিলাম, আর কোথায় অনন্ত এক নিরাশার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি! রাম অবশেষে কি না একেবারেই উল্টা বুঝিল!

সেদিন অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছিল। ভাবিলাম কুষ্টিয়ায় পৌছিতে রাত্রি প্রায় ৯টা হইবে। সেই অপরিচিত স্থানে রাত্রে কোথায় থাকিব, অনুসন্ধানই বা কি করিব? সুতরাং সে দিন আর গেলাম না।

পরদিন প্রাতে উঠিয়াই ৬৷৷০ টার ট্রেণে কুষ্টিয়ার টিকিট কিনিয়া ইষ্টদেবতার নাম করিয়া যাত্রা করিলাম। রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিয়া চাঁদপুর-মেল ধরিলাম। যখন কুষ্টিয়ায় পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা।

প্রথমেই সেখানকার বুকিংক্লার্ক বাবুর নিকট গেলাম। তিনি তখন কি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। দুই একবার ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলাম না। তারপর তাঁহার নিকটে গিয়া সমস্ত কথা বলিয়া আমার সেই রসিদখানি দেখাইলাম। তিনি বলিলেন, "তাই তো মশাই, এ তো জালিয়াতি কারখানা দেখচি। এ তো আমারই সই বটে। আমাদের বহি দেখুন। ঐ নম্বরে কালীপদ ঘোষের নামে এক মোট সুপারি ঐ দিনে বুক করা হয়েছে। চাউল তো নয়। সুপারি বুক করিয়া ঠিক-ঠিক রসিদ আমি দিয়াছি। আমাদের রেকর্ড ও কৃষ্ণনগর ডুযায়গাতেই ঠিক সুপারি আছে; কেবল আপনার রসিদে এক বোরা সুপারি কথাটীর স্থানে ৫০০ বোরা চাউল লেখা আছে। এ তো আমাদের ভুল বল্‌তে পারবেন না। তিনখানা কার্ব্বন-কপির দুখানা একরকম, আর একখানা অন্য রকম তো হয় না।" বলিয়া বাবুটি রসিদখানি আলোকের দিকে

ধরিলেন। বলিলেন—"হ্যাঁ, এই দেখুন। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, ঐখানটা দিব্যি চাঁচা রয়েছে! চেঁচে জাল করেছে। উঃ, কি সর্ব্বনেশে লোক!"

আমি বলিলাম "এখন উপায়?"

তিনি বলিলেন "সে আর আমি কি জানি বলুন। দেখুন সন্ধান করে, পুলিসে খবর দিন। আমি তো আর আপনার সুপুরি কেটে চা'ল কর্ত্তে যাই নি। আমাদেরও ফাইলে ঠিক আছে, কৃষ্ণনগরের চালানেও তাই আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে লোকটা সুপুরি বুক কত্তে এসেছিল, সে লোকটার চেহারা কি রকম বলতে পারেন?"

তিনি মেজাজটা একটু গম্ভীর করিয়াই বলিলেন "অত চেহারা মুখস্থ করতে গেলে রেলে চাকরী করা চলে না।" এই বলিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

কিন্তু সমস্ত দিন খুঁজিয়াও আমি ওয়াই, সি, রায়ের কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। নাম শুনিয়া কেহ বা হাসিল, কেহ বা কথা কহিল না, কেহ বা বিদ্রূপ করিল।

সন্ধ্যার ট্রেণে আবার গোয়াড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন প্রাতে সবইনেস্‌পেক্টার সতীশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সবই বলিলাম। তিনি বলিলেন "কালীপদ বাবু, আপনি যাবার পরই আমি পোষ্টাফিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিবারণ বাবুর সঙ্গে দেখা করে সব বলেছিলাম। তারপর তাঁর মত নিয়ে কুষ্টিয়ার পোষ্টাফিসে প্রিপেড টেলিগ্রাম করেছিলাম। তারা কি উত্তর দিয়েছে, জানেন? তারা বলেছে যে ওয়াই, সি, রায় এলাহাবাদে চলে গিয়েছে। তার টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, যা কিছু, সব সেইখানে রিডাইরেক্ট করবার জন্য পোষ্টাফিসে

চিঠি দিয়ে গিয়েছে। আমার টেলিগ্রাম পাবার আগেই তারা এলাহাবাদে টাকা রিডাইরেক্ট করে দিয়েছে। আপনি যদি রবিবারেই রওনা হয়ে গিয়ে পোষ্টাফিসটায় সন্ধান নিতেন, তা' হলেও অনেকটা সুবিধে হ'ত। আলিস্যিতেই যে বাঙ্গালী জাতটাকে খেয়ে রেখেছে। তা ভাবনা নেই; আমি এলাহাবাদে পুলিসে ও পোষ্টাফিসে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, টাকা আপনার মারা যাবে না। তবে পেতে কিছু দেরী ও খরচ হবে। এখন আপাততঃ গোটাদশেক টাকা আমাকে দিন দেখি; এই সব খরচপত্র আছে তো ?"

জামাতার দোলের তত্ত্ব করিতে হইবে বলিয়া কাপড়-চোপড় কিনিবার জন্য ১৫৲ টাকা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। কি করি, তাহা হইতেই দশটী টাকা সতীশ বাবুকে দিলাম। অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

[৪]

প্রায় ছয়মাস কোন সংবাদাদি পাইলাম না। টাকার আশা একরকম ছাড়িয়াই দিলাম। গ্রহের ফের ছিল, কি করা যাইবে ? সতীশ বাবুকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন "মশাই, একদিনেই কি কিছু হয় ?" কি আশ্চর্য্য, ছয়মাস কাটিয়া গেল, তবুও লোকটা বলে 'একদিন'। বিধাতার বিড়ম্বনা আর কি !

প্রায় আটমাস পরে একদিন সংবাদ পাইলাম, টাকা আসিয়াছে। সোসাইটীর টেলিগ্রাম পাইয়া যে আনন্দ হইয়াছিল, আবার বহুদিন পরে সেই আনন্দ অনুভব করিলাম। বক্ষের স্পন্দন আবার একটু দ্রুত হইল। তাড়াতাড়ি থানায় ছুটিয়া গেলাম। দারোগা সতীশবাবু বলিলেন, "সে রায়ের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি, সে পালিয়েছে।

আপনার ২৭০৲ টাকার মধ্যে ২৩৫৲ টাকা ফিরেছে। বাকী খরচখরচায় গিয়াছে।"

যদিও খরচখরচা বাবদে আমি ১০৲ টাকা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছিলাম, তথাপি আর তর্ক করিলাম না। ২৩৫৲ টাকা লইয়া ভগবান্ এবং সতীশ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ৺আনন্দময়ীর মন্দিরে আবার ছাগবলি পাঠাইলাম, রাত্রে আবার ৺সত্যনারায়ণের সিন্নী হইল। কিন্তু সেই একদিন, আর আজ একদিন। সেদিন ।০ আনায় হাজার মণ চাউল পাইবার আশায় ছাগবলি দিয়াছিলাম, ৺সত্যনারায়ণের সিন্নী দিয়াছিলাম, আর আজ—২৭০৲ টাকার মধ্যে ২৩৫৲ টাকা আট-মাস পরে ফেরত পাইলাম বলিয়া তেমনিই আনন্দে ছাগবলি দিতে হইল, তেমনিই উৎসাহে সিন্নী দিতে হইল—ভাগ্যবিপর্য্যয়, তাহাতে সন্দেহ কি ?

প্রতিদান

বিধিলিপি বৈ কি? রায়বাহাদুর পিতার মৃত্যুর পর তিনবৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই দুর্গাচরণের পৈতৃক সম্পত্তি প্রায় সমস্তই দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া গেল।

তাহাতেও সে বড় বিচলিত হয় নাই। কিন্তু যেদিন ভদ্রাসনখানিও ডিক্রীদাররা ক্রোক করিয়া জারি করিল, সে দিন যখন রুগ্না স্ত্রী রমার হাত ধরিয়া সে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিল, তখন অশ্রুপ্রবাহে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া গেল। রমাও কাঁদিল।

দুর্গাচরণ আশৈশব ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিল, দুঃখের আস্বাদ সে কখনও পায় নাই। কিন্তু সহসা দারিদ্র্যের একটা প্রবল তরঙ্গ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঝড়ের মত প্রবলবেগে আসিয়া তাহাকে ঐশ্বর্য্যের বক্ষ হইতে নামাইয়া একেবারে পথে বসাইয়া দিল। সে কারণ এই অননুভূত দুঃখে সে বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ছেলেবেলায় লেখাপড়ার দিকে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে বড় দেখা যাইত না, পিতা চাকর সঙ্গে দিয়া পুত্রকে স্কুলে পাঠাইতেন, দ্বিপ্রহরে সে সকলের অজ্ঞাতসারে স্কুল হইতে পলায়ন করিয়া, আঁব, জাম, লিচু পাড়িয়া, পুকুরে ও নদীতে মৎস্য ধরিয়া তাহার গ্রাম্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছে। তখন সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সে সুখময় জীবনের এমন দুঃখময় পরিণাম হইতে পারে।

রমাকে সে বলিল, "রমা! আমার চেয়ে তোমার কষ্টটাই বেশী হবে। এই ঠাণ্ডায়, স্যাঁতসেতে ঘরে, ঐ অসুখ নিয়ে খুবই ভুগবে,

তার ওপর একটী পয়সা নেই যে ডাক্তারের ভিজিট দিই।" তাহার কথাগুলি তখন ভারি হইয়া উঠিয়াছিল।

দুঃসাধ্য ক্ষয়কাশে রমা ভুগিতেছিল। সে তাহার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "কিছু না, আমার আবার কষ্ট কিসের? তুমি বরং একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা দেখ, তাইতেই আমাদের সংসার চলে যাবে।"

"আমার মত মূর্খকে কে চাকরী দেবে রমা!" দুর্গাচরণ কাঁদিয়া ফেলিল।

রমার রোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। পাড়ার একজন ডাক্তার আসিয়া বলিলেন "বেশ পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করুন, শরীরের পুষ্টিসাধন করাই এ রোগের চিকিৎসা।"

বায়ুপরিবর্ত্তন করিলে স্বাস্থ্যের অধিকতর উন্নতি হইতে পারে, একথাও ডাক্তার বলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণ চক্ষের সম্মুখে কেবল একটা নিরাশার সমুদ্র দেখিল।

তার পর রমার অনুরোধের ফলে চাকরির চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে অবশেষে খিদিরপুর ডকে ১৫৲ বেতনে তাহার একটী চাকরি জুটিল। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও সে প্রতিদিন প্রাতে শ্যামবাজার হইতে খিদিরপুরে হাঁটিয়া যাইত, আবার সন্ধ্যার সময় পদব্রজেই ফিরিত।

[২]

সেদিন সন্ধ্যার সময় ইডেন গার্ডেনে কেল্লার বাজনা বাজিতেছিল। সাহেব মেম হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালী বাবু, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান প্রভৃতিতে রাজোদ্যান কোলাহলমুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে একটী অশ্বথবৃক্ষের অন্তরালে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া দুর্গাচরণ আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। মাসিক ১৫৲ টাকা মাহিনার মধ্যে ৫৲ টাকা ঘরভাড়া দিতে হইবে, বাকি ১০৲ টাকার মধ্যে একমাস উভয়ের সংসারখরচ ও রমার ঔষধপথ্যের খরচ চালান কতটা সম্ভবপর তাহা ভাবিয়া একটা দারুণ নিরাশার তীব্র জ্বালায় সে ছটফট করিতেছিল এবং ভবিষ্যৎটাকে একটা ভীষণ দুঃখ ও দারিদ্র্যময় দেখিতেছিল।

অদূরে আর একখানি বেঞ্চে দুইটী ইংরাজমহিলা পিজবোর্ডের বাক্স ও কাগজের প্যাকেটে মোড়া রাশীকৃত দ্রব্যাদি সমস্ত বেঞ্চিখানিতে বিক্ষিপ্ত করিয়া তাহা গুছাইতে ব্যস্ত ছিলেন। গলায় বক্‌লেস ও তাহাতে ঝুমঝুমি দেওয়া একটা সাদা ল্যাজকাটা কুকুর তাঁহাদের পদতলে বসিয়া নিজের গা চাটিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে রাত্রি হইল। ব্যাণ্ড নিস্তব্ধ হইল, বাগানও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন হইল।

একটী ঝাড়ুদার ঝাড়ু হস্তে নিজকার্য্যে যাইতেছিল, মেমদুটীর মধ্যে একজন তাহাকে ডাকিয়া তাঁহাদের জন্য একখানি গাড়ী ডাকিতে আদেশ করিলেন। একবার তাঁহাদের দিকে চাহিয়া, হস্তস্থিত ঝাড়ু উত্তোলিত করিয়া সেলাম জানাইয়া ঝাড়ুদার চলিয়া গেল, আর ফিরিল না।

যিনি গাড়ী ডাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যে ঝাড়ুদার ফিরিল না, তখন প্রথমে বিড় বিড় করিয়া কি বকিলেন, তার পর বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে এদিক ওদিক একবার চাহিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে দুর্গাচরণের নিকট আসিয়া বলিলেন, "মশাই, আপনার নিকট একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে পারি?"

ভাঙ্গা ইংরাজীতে সে জানাইল যে স্বচ্ছন্দে পারেন। অনুগ্রহের কথা পরিত্যাগ করিয়া মেমসাহেব যদি তাহাকে কোন আজ্ঞা করেন, তাহাও পালন করিতে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

ধন্যবাদ জানাইয়া মেম বলিলেন যে তাঁহার সঙ্গে অনেক জিনিষপত্তর, এবং তাঁহার সঙ্গিনীটি একজন বড়লোকের পত্নী। কেবল তাহাই নয়, কলিকাতায় তাঁহরা নূতন আসিয়াছেন। দুর্গাচরণ যদি দয়া করিয়া আলিপুর যাইবার জন্য একখানা গাড়ী তাঁহাদের জন্য ডাকিয়া দেয় তাহা হইলে তিনি বড়ই কৃতজ্ঞ হইবেন।

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দুর্গাচরণ উঠিল। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ীর সহিস সহ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে গাড়ী গেটের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইয়া মেম উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গিনীটিও উঠিলেন। জিনিষপত্র লইয়া সহিস তাঁহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

অল্পক্ষণ বসিয়া দুর্গাচরণও উঠিল। সহসা তাহার দৃষ্টি বেঞ্চের তলায় ঘাসের উপর একটি চাকচিক্যময় দ্রব্যের উপর নিবদ্ধ হইল।

চমকিত হইয়া দুর্গাচরণ চারিদিক চাহিল। তার পর নিকটে কেহ নাই দেখিয়া সেটীকে কুড়াইয়া লইল। গাছের পাতার ভিতর দিয়া গ্যাসের আলো আসিতেছিল। তাহাতে সে দেখিল যে সচরাচর মেমেদের হস্তে যেরূপ লম্বা মণিব্যাগ বা পার্স থাকে, এটীও সেই শ্রেণীর একটী সোণার জালি বোনা পার্স।

তাহার বক্ষ দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছিল। সে আবার চারিদিকে চাহিল। একবার ভাবিল যে মেমসাহেবকে ফিরাইয়া দিয়া আসি।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে বুঝিল যে তাঁহাদের গাড়ী এতক্ষণ বহুদূর গিয়াছে। তাহার অনুসরণ করা এখন বৃথা।

সে আবার এদিক ওদিক চাহিল। তার পর বিনা বাক্যব্যয়ে সেটাকে পকেটস্থ করিয়া গৃহাভিমুখী হইল।

[৩]

দুর্গাচরণ যখন গৃহে পৌঁছিল তখন রাত্রি প্রায় ৯টা। রমা চুপ করিয়া দেওয়াল ঠেস দিয়া বসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া বলিল "এত রাত্তির হোল তোমার ?"

"হ্যাঁ, আসতে আসতে আজ রাত্তির হয়ে গেল, ডাক্তারবাবু এসে-ছিলেন ?"

"না আসেন নি এখনও, আর কিই বা হবে ডাক্তার দেখিয়ে, কেবল কতকগুলো পয়সা ওষুধপত্রে নষ্ট করা বৈ ত নয়।"

পাড়ার ডাক্তার বিনা ভিজিটেই আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তিনি দুর্গাচরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগী দেখিয়া প্রেসক্রুপ্সন লিখিয়া বলিলেন, "রোগীকে কোন ভাল যায়গায় চেঞ্জে নিয়ে যান, আর মন যাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে সে বিষয়ে দেখবেন। আপনি সমস্ত দিন আফিসে থাকেন, একজন ঝি কিম্বা অন্য স্ত্রীলোক যদি সমস্ত দিন এঁর কাছে থেকে এঁর মনটা অন্য দিকে চালিত কর্ত্তে পারে তা হলে বড়ই সুবিধা হয়। এ সব রোগে ঔষধের চেয়ে ঐগুলোই বেশী দরকার।"

দুর্গাচরণ বলিল "ডাক্তার বাবু! আপনার ঋণ এ জীবনে শোধ দিতে পারবো না। তবে আমার অবস্থাটা দেখচেন তো।"

অপরিশোধনীয় ঋণের মত তিনি যে কিছুই করেন নাই, তাহা বিনীতভাবে জানাইয়া ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন।

কাপড় ছাড়িয়া, হাতমুখ ধুইয়া দুর্গাচরণ ঘরের দ্বার বন্ধ করিল। রমা পার্শ্বের কক্ষে রন্ধন করিতে গেল। শারীরিক অসুস্থতা স্বত্বেও রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য তাহাকেই করিতে হইত।

জামার পকেট হইতে দুর্গাচরণ সেই পার্স টি বাহির করিয়া আলোকে ধরিল। আলো পড়িয়া তাহা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। দুর্গাচরণ শিহরিল।

পার্সটী খুলিয়া তাহার মধ্যে সে যাহা দেখিল তাহাতে আরও চমৎকৃত হইল। তাহার মধ্যে একটী রত্নখচিত ব্রোচ ছিল, তাহাতে খুব বড় একটী "F" লেখা ছিল। তাহার ঠিক মধ্যস্থলে একখানি নাতিক্ষুদ্র হীরক জ্বল-জ্বল করিতেছিল, উভয় পার্শ্বে একটী করিয়া চুণি, তার পর উভয় দিকেই একটী করিয়া মুক্তা, আবার একটী কারয়া চুণি। প্রদীপের আলোকে ব্রোচটী যেন আরও চাকচিক্যময় হইয়া উঠিল। দুর্গাচরণের মুখ হইতে অস্ফুট স্বরে ধ্বনিত হইল "ভগবান!"

ব্রুচটী ছাড়া ব্যাগটার মধ্যে আরও একখানি ১০৲ টাকার নোট ছিল, ৫টী খুচরা টাকা ছিল এবং সিকি দুয়ানিতে এগার আনা ছিল।

দুর্গাচরণ আবার সেগুলি গণনা করিয়া নিজমনে বলিতে লাগিল, "পনের টাকা এগার আনা। প্রায় ষোল টাকা, একমাসের মাইনে।" তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিতে লাগিল। এরূপ ব্যাপার তাঁহার জীবনে কখনও ঘটে নাই। ধনীর পুত্র সে, দারিদ্র্যের তাড়নায় অপরের ধনে কখনও সে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহে নাই। সে আবার শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহার রমা! তাহার এত দুঃখ-দারিদ্র্যেও তাহার সুখ,

ঐশ্বর্য্য, শান্তি, সর্ব্বস্ব রমা ! সে বিনা চিকিৎসায় ভুগিতেছে। অর্থাভাবে তাহার শুশ্রূষা হইতেছে না, পথ্যাভাবে সে শীর্ণা হইয়া যাইতেছে। ভগবান ! এ কি তোমারই প্রেরিত দান ? একদিকে অর্থাভাব, জীবন-ব্যাপী দারিদ্র্য, অন্য দিকে বিবেক ও কর্ত্তব্যের তাড়না। সে সমস্যায় পড়িল। ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিল না যে সে কি করিবে !

কি করিবে ? ষোল টাকা নগদ, ব্রূচটীর দাম অন্যূন পাঁচশত টাকা, ব্যাগটীর দামও প্রায় শতাধিক টাকা, হিসাব করিয়া দুর্গাচরণ দেখিল যে তাহাতে এক বৎসরের সংসারখরচ চলিবে, রমার উত্তমরূপ চিকিৎসা হইবে, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইবে এবং তাহার শুশ্রূষা পথ্যেরও কোন অভাব ঘটিবে না। সে কুড়াইয়া পাইয়াছে, সে তো তস্কর নয় ! সে দাতার দান প্রতিগ্রহ করিয়াছে মাত্র ! তাহাতে তাহার কি পাপ হইয়াছে ভগবান ! তবে যদি ধরা পড়ে ? দুর্গাচরণ সেকথা ভাবিতেও পারিল না।

রমা আহারের জন্য ডাকিল। অগত্যা টাকা ও ব্রূচসহ ব্যাগটী একটী কাগজে মুড়িয়া বিছানার তলায় রাখিয়া সে আহার করিতে গেল।

আহারে বসিয়া সে বলিল, "রমা, তোমাকে মধুপুরে নিয়ে যাব।" তাহার স্বর ঈষৎ কম্পিত।

রমা কোন কথা কহিল না, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ বিকৃত করিল মাত্র।

সে আবার বলিল "ডাক্তার একটা ঝি রাখতে বলেছেন, তুমি পাড়ার গিন্নীদের বলে একটা ঝির সন্ধান করো, পেলেই আমি রাখবো।"

রমা এবার বলিল. "পয়সা ! পয়সা কোথা থেকে জুটবে ? ১০৲ টাকায় দুজনের সংসার চলবে না ঝির মাইনে দেবে ?"

দুর্গাচরণ ভাবিতেছিল যে সমুদয় ব্যাপার রমাকে বলিবে কি না।

অস্ফুটস্বরে সে রমার প্রশ্নের উত্তরে কেবল মাত্র বলিল, "ভগবান দেবেন। এ দুঃখের দিন চিরকাল থাকবে না এটা জেনো।"

সে রাত্রে দুর্গাচরণের ঘুম হইল না। সে যে কি করিবে, তাহাই ভাবিয়া পাইল না।

পরদিন প্রত্যুষে ডাক্তার বাবু আসিয়া দুর্গাচরণকে বলিলেন, "দেখুন, আপনি আমার কথা শুনছেন না, কিন্তু এই ঠাণ্ডা স্যাঁত সেঁতে ঘরে আর বেশী দিন থাকলে অসুখটা ক্রমেই বেশী হয়ে পড়বে, তখন মুস্কিলে পড়বেন। এখনও স্থানান্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করুন।"

দুর্গাচরণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মস্তিস্কে যেন একটা অগ্নিকুণ্ড তখন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল।

ডাক্তার বাবু হস্তস্থিত সংবাদপত্রখানি দুর্গাচরণকে দিয়া বলিলেন, "ওতে নূতন লাটসাহেবের ছবি ও তাঁর জীবনী আছে। আপনি ওটা পড়ে বাংলাকরে ওঁকে বোঝাবেন, তাহলেও ওঁর মনটা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও অন্যদিকে চালিত করা হবে।"

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণ কাগজখানি খুলিয়া দেখিল যে সেই তারিখের একখানি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান। লাট সাহেবের চিত্র ও জীবনীর প্রতি সে কিছু মাত্র মনোনিবেশ না করিয়া উৎসুকচিত্তে সংবাদস্তম্ভ খুঁজিতে লাগিল। অনুসন্ধানের পর দেখিল যে এক জায়গায় লেখা আছে যে গত কল্য রাত্রি প্রায় ৯টার সময় সার আর্থার রিচার্ডসনের পত্নী লেডী রিচার্ডসন তাঁহার এক সখীর বাড়ী সান্ধ্যভোজ সমাপন করতঃ গৃহে ফিরিতেছিলেন। হেষ্টীংস পার্কের নিকট পদব্রজে ভ্রমণ কালীন কয়েক-জন দস্যু তাঁহাকে অতি নির্দ্দয়ভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। তাহার অঙ্গে মুক্তার একছাড়া নেকলেস্ ছিল, হাতে সোনার ব্রেসলেট ছিল, জামায় একটী বহুমূল্যবান রত্নখচিত "F" অঙ্কিত ব্রোচ

ছিল। পুলিস তদন্ত চলিতেছে। সহরের মাঝখানে এরূপে দস্যুর উপদ্রব হওয়া কলিকাতা পুলিসের পক্ষে যে কতদূর ঘৃণার কথা, তাহা ষ্টেটস্‌ম্যান উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

কাগজখানা দুর্গাচরণের হাত হইতে পড়িয়া গেল। তাহার বক্ষঃস্থল তখন সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল, সে চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিতেছিল।

রমা বলিল "ঘুমুচ্ছো নাকি? কৈ দেখি লাটসাহেবের ছবি কেমন?

দুর্গাচরণ দেখাইল। রমা রাজপ্রতিনিধির চিত্র সম্বন্ধে নানা সমালোচনা করিতে লাগিল। দুর্গাচরণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে কি ভাবিয়া আবার কাগজখানি তুলিয়া লইয়া বিজ্ঞাপন স্তম্ভগুলি দেখিতে লাগিল। কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও সে লেডী রিচার্ডসনের কোন বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল না। আবার খুঁজিল, সেবার দেখিল যে এককোণে লেখা আছে বটে যে গতরাত্রে লেডী রিচার্ডসনের দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত দ্রব্যাদির যে কেহ সন্ধান দিতে পারিবেন তিনি বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইবেন। "F" অঙ্কিত হীরামুক্তা খচিত একটী ব্রুচের সংবাদ যিনি দিতে পারিবেন তিনি স্বতন্ত্র ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন। ষ্টেট্‌সম্যান আফিসের বিজ্ঞাপন বিভাগের বাক্সবিশেষে পত্রাদি লিখিতে হইবে।

দুর্গাচরণের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। কাগজখানা লইয়া তাহার মধ্য হইতে বিজ্ঞাপন ও সংবাদ দুইটাই ছুরী দিয়া কাটিয়া লইল। তারপর সে যে কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। উদ্‌ভ্রান্তভাবে সে ডাকিল "রমা।"

রমা বাহিরে গিয়াছিল। আসিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিল। দুর্গাচরণ অকপট চিত্তে সমস্ত বিবরণ তাহাকে বলিল। সমস্ত শুনিয়া রমা বলিল "তা একথা আমাকে কাল বলনি কেন?"

"কি যে করবো কাল কিছু ভেবে ঠিক কর্ত্তে পারিনি, তাই তোমাকে বলবো বলবো করেও কিছুই বলিনি। এখন কি করি বল দেখি ?"

রমা বলিল "ফিরিয়ে দাও। যা যা পেয়েছ সমস্ত নিয়ে গিয়ে সেই মেমকে আগাগোড়া সব বলে ফিরিয়ে দাও। খবর্দ্দার, কিছু গোপন করো না বা মিথ্যা বলতে চেষ্টা করো না।

দুর্গাচরণ একটু চুপ করিল, তারপর বলিল "কিন্তু ভগবান এগুলো আমাকে দিয়েছেন রমা। আমি তো চোর নই, আমি তাঁরই দান নিয়েছি।

রমা বলিল "ও কথা বলো না। আমরা গরীব হলেও লোভী নই। ভগবান যেন ও মতি গতি কখনও না দেন। আমাদের অভাব আছে অভাবই থাকুক, পরের পয়সা অসাধু উপায়ে পেয়ে রাজা হতেও আমি চাই না। তুমি যাও, এখনিই ফিরিয়ে দিয়ে এসো।"

রমার মুখ চক্ষে যেন একটা পবিত্রতার দীপ্তি উদ্ভাসিত হইতেছিল। দুর্গাচরণ বলিল "বেশ, তাই হবে। সত্যি বলেছ রমা, আমরা গরীব বটে, কিন্তু পরের জিনিষে লোভ কত্তে ভগবান যেন প্রবৃত্তি না দেন।"

আফিসে একদিনের ছুটীর দরখাস্ত করিয়া দুর্গাচরণ দ্বিপ্রহরে রওনা হইল। ষ্টেটশম্যান আফিসে লেডী রিচার্ডসনের ঠিকানা জানিয়া লইয়া সে যখন আলিপুরে পৌছিল তখন বেলা প্রায় ১টা।

[৪]

সুসজ্জিত কক্ষে লেডী রিচার্ডসন বসিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছিলেন এমন সময়ে খানসামা আসিয়া জানাইল যে একজন বাবু মেম সাহেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। মেমসাহেব সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রয়োজন তাঁহার সঙ্গে না সাহেবের সঙ্গে।

খানসামা জানাইল যে সাহেবের কথা বাবুটী আদৌ বলেন নাই, মেমসাহেবের সহিতই তিনি সাক্ষাৎ করিতে চান।

মেমসাহেব খানসামাকে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন।

খানসামা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে তাঁহার হারাণো জিনিষের সন্ধান দিতে বাবুটী আসিয়াছেন। মেম তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাবুকে সেখানে আনিতে আদেশ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দুর্গাচরণ সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া মেমকে সেলাম করিয়া বিনীতভাবে জানাইল যে পূর্ব্বরাত্রে সেই ইডেন গার্ডেনে তাঁহাদের গাড়ী ডাকিয়া দিয়াছিল।

আহ্লাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার হৃতদ্রব্যাদির সম্বন্ধে তিনি কি সন্ধান দিতে পারেন।

দুর্গাচরণ এদিক ওদিক একবার চাহিল। লেডী রিচার্ডসনের সঙ্গিনীটী তখন সেখানে ছিলেন না। তারপর চাদর দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া একবার ঢোক গিলিয়া বলিয়া ফেলিল, "এইটী আমি পেয়েছি" বলিয়া পকেট হইতে একটুকরা কাগজে জড়ানো সেই ক্রুচটী বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ টিপাইয়ে রাখিল।

আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া লেডী রিচার্ডসন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "ক্রুচটী আপনি পেয়েছেন? ধন্য ভগবান! আপনার কাছে আমি যে কি করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমার অন্যান্য জিনিষের মধ্যে এইটী যাওয়ায় আমার মনে বড় কষ্ট হয়েছিল। কেন জানেন? এটী আমার স্বর্গগতা জননীর স্নেহোপহার।"

দুর্গাচরণ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিল।

মেমসাহেব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়, কি করে পেলেন এটাকে?"

দুর্গাচরণ একবার কাশিল। তারপর আর একটা ঢোক গিলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "আজ খবরের কাগজে ব্যাপারটা পড়েই আমার মনে হোল যেন আমি কাল যাঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়েছি তিনিই লেডী রিচার্ডসন। কাজেই একটু খোঁজ নিতে বড় কৌতুহল হোল। সেই জন্যে আজ বেলা ১০ টার সময় বাড়ী থেকে এসে সেই পার্কের মধ্যে খুঁজতে লাগলুম। অবশেষে একজায়গায় ঘাসের মধ্যে এটাকে পেয়েছি।"

শেষের কথাগুলি বলিবার সময় তাহার স্বর কম্পিত হইল।

মেমসাহেব বলিলেন "আবার আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। যথার্থই আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।"

দুর্গাচরণ বলিল, "আমি অতি গরীব, আমার পিতা ধনী ছিলেন, কিন্তু আমি পথের ভিখারী, আমার স্ত্রী রোগশয্যায়, অর্থাভাবে তাঁর চিকিৎসা করাতে পাচ্ছি না। তাঁর ওষুধ পথ্য কিনতে পারি এমন সংস্থান আমার নাই। খবরের কাগজে পুরস্কারের কথাটা দেখে আমার আশা হয়েছিল—"

লেডী বলিলেন, "নিশ্চয়ই, কেবল পুরস্কার নয়, পুরস্কারের অনেক বেশী আপনার প্রাপ্য। আপনি দরিদ্র হলেও মহৎ।" বলিয়া পার্শ্বস্থ আলমারি খুলিয়া একখানি writing case বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে ১০০৲ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া তাহার পৃষ্ঠে নিজ নাম এনডোর্স করিয়া দিলেন।

ঠিক সেই সময় দ্বার খুলিয়া এক সাহেব কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাদ্বর্ত্তী খানসামার হস্তে টুপী ও ছড়ি দিয়া মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ফ্লোরেন্স, এ কে?"

দুর্গাচরণ বুঝিল যে ইনিই সার আর্থার রিচার্ডসন। ভয়ে ও আতঙ্কে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল।

মেমসাহেব সমস্ত বিবরণ বলিলেন। সাহেব একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন "আপনি এই ব্রূচটা কুড়িয়ে পেয়েছেন ?"

শুষ্কমুখে দুর্গাচরণ বলিল "হ্যাঁ।"

"কোথায় ?"

"যেখানে ঘটনা হয়েছিল বলে প্রকাশ, সেইখানে, সেই পার্কেই।"

পকেট হইতে রবারের পাউচ বাহির করিয়া সিগার ধরাইয়া সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "পার্কের কোন জায়গায় ?"

একটু থতমত খাইয়া দুর্গাচরণ বলিল, "গেটের কাছে, ঘাসের মধ্যে।"

সাহেব গম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন "কটার সময়ে ওটাকে কুড়িয়ে পেয়েছেন ?"

দুর্গাচরণের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল। সে ঢোক গিলিয়া বলিল "বেলা দশটা কি এগারটার সময়।

ঘরের মধ্যে ঠিক তাহার মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখা চলিতেছিল, তথাপি সে গলদঘর্ম্ম হইতেছিল। একসঙ্গে এতগুলি মিথ্যাকথা সে জীবনে কখনও বলে নাই।

সাহেব সিগারে এক টান দিয়া মুখখানি আরও গম্ভীর করিয়া বলিলেন "দেখুন, আপনাকে আমি পুলিসে দিব।"

দুর্গাচরণ একলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল। যে চেয়ারখানিতে সে বসিয়াছিল সেখানি উল্টাইয়া পড়িল। সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে কোন কথা কহিতে পারিল না। চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল।

সাহেব বলিতে লাগিলেন "দেখুন প্রায় ১০।১২ জন পুলিসের লোক নিয়ে আমি আজ সকালে পার্কের গেট ও তার চারি পাশে সমস্ত জায়গার প্রতি ইঞ্চি খুঁজিয়েছি। তারা প্রত্যেক ঘাসের পাতা উল্‌টে

দেখেছে। সুতরাং ১০।১১টার সময় আপনি যে ঘাসের মধ্যে ঐ ক্রুচটি পেয়েছেন, এ কথা আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছি না। হয় আপনি চোরেদের মধ্যে এক জন, না হয় সে দলের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ট সংশ্রব আছে।”

লেডী রিচার্ডসন বাধা দিয়া বলিলেন, “না, না উনি কাল সন্ধ্যাবেলা ইডেন গার্ডেনে আমাদের গাড়ী ডেকে দিয়েছিলেন। উনি লোক অতি মহৎ।”

মৃদু হাসিয়া সাহেব বলিলেন, “তা হলে ঠিকই হয়েছে। ইডেন গার্ডেনে বদমাইসটা তোমার জামায় ঐ ক্রুচটা দেখেছিল। তোমার গাড়ী ডাকতে যাবার সময় নিজের দলবলকে খবর দেয়, নিজেও সেই গাড়ীতেই কিম্বা তারই পিছনে পিছনে অন্য গাড়ীতে এসে অবশেষে পার্কে ঐ কীর্ত্তি করেছে।”

দুর্গাচরণ কাঁদিয়া ফেলিল। আসিবার সময় রমা তাহাকে সমস্ত বিবরণ মিথ্যা না বলিয়া যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল। কেন তাহার এ দুর্ব্বুদ্ধি হইল।

সে আবার ২।১ বার ঢোক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে অপেক্ষাকৃত আর্দ্রস্বরে অতি কষ্টে বলিল “সাহেব, ভগবানের নামে আমি শপথ করে বলছি আমি চোর নই, আমি ও জিনিস কুড়িয়েই পেয়েছি। কেবল ওইটী নয়, ওর সঙ্গে আরও অনেক জিনিস ছিল।” বলিয়া সে পকেট হইতে সোনার সেই পার্শ ও তাহার ভিতরে টাকা পয়সা প্রভৃতি যহা কিছু ছিল তাহা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। সাহেব ও মেম উভয়েই অস্ফুট আর্ত্ত নাদের সহিত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন।

স্বরকে দৃঢ় করিয়া দুর্গাচরণ বলিল “আমি ধনী পিতার সন্তান, আমি

নিজের অদৃষ্টদোষে এই অবস্থায় পড়েছি। আমার পিতা রায়বাহাদুর ছিলেন।" বলিয়া সে পিতার নাম বলিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ঠিকানা কোথায়?"

দুর্গাচরণ নিজের ঠিকানা বলিল এবং তাহার দারিদ্র্যের বর্ণনা করিয়া তার স্ত্রীর রোগের কথা, ঔষধ পথ্যের অভাবের কথা সমস্তই একে একে একে অকপটে বলিয়া গেল। তাহার কথা শেষ হইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যাগটিও কি পার্কের ঘাসের মধ্যে পেয়েছেন?"

মুখ নত করিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া দুর্গাচরণ বলিল "না সাহেব আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কচ্ছি। আমি মিথ্যাবাদী। দারুণ অর্থকষ্টে পড়েই আমাকে মিথ্যা একটা গল্প সাজিয়ে বলতে হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন।" বলিয়া সে যে উপায়ে ব্রুচসহ ব্যাগটী পাইয়াছিল তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিল।

সাহেব বলিলেন, "দরিদ্র হইলেও আপনি মহৎ বটে। আমার স্ত্রী সত্যই বলিয়াছেন।" বলিয়া নোটখানি পত্নীর হাত হইতে লইয়া তাহার হস্তে দিলেন।

কোন কথা না বলিয়া ঘাড় নীচু করিয়া দুর্গাচরণ চলিয়া গেল।

সাহেব ও মেম উভয়ে উচ্চহাস্য করিলেন; মেম বলিলেন "একসময় লোকটার অবস্থা ভাল ছিল, এখন অবস্থা বিপর্য্যয়ে গরীব হয়ে পড়েছে। লোকটা নিজের নির্দ্দোষিতা বেশী করে প্রমাণ কর্ত্তে গিয়াই কেবল কতকগুলি মিথ্যা কথা বলেছে। ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন।"

এমন সময় খানসামা আসিয়া কয়েকটুকরা কাগজ সাহেবের হাতে দিয়া জানাইয়া গেল যে পূর্ব্বোক্ত বাবুটি গেটের নিকট কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া তৎপর চলিয়া যাইবার সময় পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া গিয়াছেন। ছিন্ন

খণ্ডগুলিকে নোট মনে করিয়া খানসামা সাহেবকে দেখাইতে আনিয়াছে।

সাহেব ও মেম উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে সেগুলি তাঁহাদের প্রদত্ত সেই একশত টাকার নোটের ছিন্ন খণ্ড।

[৫]

দুর্গাচরণের বাড়ী খুঁজিতে সার আর্থার রিচার্ডসনকে একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার গৃহচিকিৎসক সহ সস্ত্রীক সেই ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন তখন কেবল দুর্গাচরণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল তাহা নহে, পাড়ার অনেক লোক অল্পকাল মধ্যেই সেখানে আসিয়া জুটিল।

দুর্গাচরণের করমর্দ্দনপূর্ব্বক লেডী রিচার্ডসন বলিলেন, "বাবু তোমার হৃদয় যে এত উচ্চ তা জানিতাম না। আমার গৃহচিকিৎসককে সঙ্গে আনিয়াছি ইনি প্রতিদিন তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া যাইবেন, ইহার ভিজিট ও ঔষধপথ্যের সমস্ত খরচ আমি বহন করিব। তোমার স্ত্রীকে যদি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হয়, তাহার খরচও আমি দিতে প্রস্তুত আছি। আমি তোমার মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।"

সার আর্থারও সেই কথার সমর্থন করিলেন।

বিস্ময়ে ও পুলকে দুর্গাচরণের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দ্বারের পার্শ্বে রমা বসিয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল "রমা, এঁকে প্রণাম কর, ইনি আজ থেকে আমাদের ধর্ম্ম মা।"

দুর্গাচরণ লেডী রিচার্ডসনের চরণ স্পর্শ করিয়া আভূমি প্রণাম করিল। অন্তরাল হইতে গলায় আঁচল দিয়া রমাও তাঁহাকে প্রণাম করিল।

অভ্যাগত

[১]

দীর্ঘ কিছুদিনের জন্য একটু অবকাশ পাইলেই এবং সুবিধা হইলেই দেশভ্রমণ করাটা এখন সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মক্লান্ত জীবনের মধ্যে যে কয়টা দিনের জন্য একটু অবসর লাভ করা যায়, সেই কয়টা দিনই একটু নিরালায় বসিয়া হাঁপ ছাড়িবার জন্য অথবা ভারতের পুণ্য-স্থানাদি দর্শন করিবার জন্য মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেই কারণেই যে দিন বড়দিনের ছুটীর শেষ হইল সেই দিনই 'ক্যালেণ্ডার' দেখিয়া গণনা করিয়া রাখিয়াছিলাম যে পূজার বন্ধ হইতে আর নয়মাস তেরদিন মাত্র বাকী আছে !

জলের স্রোতের ন্যায় দিনগুলি যাইতে লাগিল। ক্রমে যখন বুঝিলাম যে ছুটী হইতে আর পনেরটি দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন হইতেই ছুটীতে কোথায় যাইব, তাহারই নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

বন্ধুবর সতীশ বলিল যে তাহার শ্বশুর জামতাড়ায় থাকেন, পূজায় সেও সেখানে যাইবে স্থতরাং আমি যদি তাহার সঙ্গী হই, তাহা হইলে সে অত্যন্ত আনন্দিত হইবে।

সে কথায় প্রতিবাদ করিয়া স্থরেন বলিল যে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যই যদি বিদেশে যাওয়া আমার অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে তাহার মতে রাঁচি যাওয়াই ভাল, এমন কি সেখানে তাহার জনৈক বন্ধুর নিকটে আমার পরিচয়পত্রও দিতে সে প্রস্তুত।

সতীশ ও স্থরেন উভয়ের মধ্যে তখন মহা তর্ক বাধিল। সতীশ

বলিল যে রাঁচির কেবল নামডাকই আছে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই। রাঁচির জলে অভ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সে অনেক প্রমাণ দেখাইল।

তাহার আপত্তি খণ্ডন করিয়া সুরেন্দ্র তাহাকে বুঝাইল যে রাঁচির জলে অভ্রের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহাতে লৌহের পরিমাণ অনেক বেশী।

সে স্থলে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রাঁচির জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা অপেক্ষা বিষয়ান্তরে মনোযোগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া অগত্যা আমি সেস্থান ত্যাগ করিলাম।

এইরূপে অনেকস্থনের কথা অনেকেই বলিলেন। হাজারীবাগে আমার জনৈক আত্মীয় থাকিতেন, তিনি সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া লিখিলেন। পুরী হইতে রমেশ লিখিল "এখানেই এসো।"

ওয়ালটেয়ারে আমার এক বিলাত ফেরত বন্ধু সপরিবারে থাকিতেন কেবল তিনিই আমার পত্রোত্তরে জানাইলেন যে আমার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে দেশভ্রমণে যাওয়ার প্রস্তাব অসঙ্গত তো বটেই, বরং কলিকাতায় থাকিলে আমার সকল বিষয় সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। বিদেশের অসুবিধার কয়েকটি উদাহরণও তিনি সেই পত্রে দিয়াছিলেন।

তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া আর সে প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট উত্থাপিত করি নাই।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—এইরূপে নানাবন্ধুর নানা অনুরোধের পরিণাম এই হইল যে এবার পূজায় আমার কোথাও যাওয়াই হইল না। কোথায় যে যাইব তাহারই নির্ব্বাচন করিতে পারিলাম না। সুতরাং পূজার দিন কটা মামুলীভাবে কাটিতে লাগিল।

[২]

সেদিন মহাষ্টমী। বেলা প্রায় ১২টার সময় আহারাদি করিয়া খবরের কাগজটা হাতে করিয়া বাহিরের ঘরে একখানি আরাম কেদারায়

অঙ্গভার রাখিয়া একাগ্রচিত্তে কর্ম্মখালীর কলমটী পড়িতেছিলাম। যদিও প্রায় ১৭ বৎসরকাল গভর্ণমেণ্ট সার্ব্বিস করিতেছি এবং অন্য কোন ভাল চাকরী জুটিলেও এখন আর করিবার উপায় নাই, তথাপি কর্ম্মখালির কলমটি পড়া যেন যুদ্ধের টেলিগ্রাম পড়া অপেক্ষাও অধিক অভ্যাসাধীন হইয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখের দরজা খোলা ছিল তাহা দিয়া দ্বিপ্রহর রৌদ্র অবাধে গৃহমধ্যে আসিতেছিল। জনপূর্ণ কলিকাতার পথ তখন অনেকটা জনহীন হইয়াছিল।

সহসা সেই রৌদ্রে যেন কার ছায়া পড়িল। চমকিত হইয়া দেখিলাম যে দ্বারে হাত দিয়া প্রায় ত্রিংশৎবর্ষীয় একব্যক্তি দণ্ডায়মান, তাহার পরিধানে একখানি আধময়লা কাপড়, গায়ে একখানি ফরসা উড়ানি, পদদ্বয় নগ্ন, মস্তকের চুল অবিন্যস্ত।

আমি চাহিতেই লোকটা একটা নমস্কার করিয়া বলিল, "বাবু, কাল রাত্তির থেকে কিছু খেতে পাই নি, দুটি খেতে দেবেন?"

সন্দিগ্ধচিত্তে আবার তাহার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, বেশ সুগঠিত দেহ, মাংসল ও তেজব্যঞ্জক। চক্ষু দুটী যেন জ্বলিতেছে। ভয়ও একটু হইল। যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে কোন ছদ্মবেশী ডাকাত নয় তো! সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাপু তোমার নামটি কি?"

লোকটি খুব মৃদুস্বরে উত্তর করিল "রামচরণ।"

"তোমরা—"

"কৈবর্ত্ত! বাবু কৈবর্ত্ত!" বলিয়াই সে বসিয়া পড়িল।

আমার সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল। বলিলাম "কেন বাপু! কিছুই খাওনি কেন? কলকাতা সহরে তো পয়সা থাকিলে খাবার ভাবনা থাকে না!"

"পয়সা কোথায় পাব বাবু! খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, কেবল আপনারই দরজা খোলা দেখলাম, আপনিও বসে রয়েছেন, কাজেই দুটো ভাত চেয়েছি। আমরা ভিখারী নই বাবু, আমরা ভিখারী নই।"

লোকটার নয়নকোণে অশ্রু দেখা দিল।

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি কর।"

"কিছুই করিনা। কি আর করব মশাই। দুনিয়ায় করবার কি আছে। বাবু কি জমীদার?"

"না বাপু, জমীদারী কোথায় পাব, এখানে একটা আফিসে চাকরি বাকরি করে কোন রকমে সংসারটা চালাই এই মাত্র।"

"তবে দিন বাবু দিন দুটো ভাত দিন। খেয়ে সব কথা বলব। না খেয়ে আর কথা কইতে পাচ্ছিনে।"

আমি ডাকিলাম "ছক্কন।"

"আজ্ঞে যাচ্ছে" বলিয়া ছক্কন সিং প্রবেশ করিল। তাহার সিং উপাধিটা আমারই দত্ত। সে উপাধি যে তাহার সিংহের ন্যায় বিক্রম দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দিয়াছিলাম তাহা নহে, সিংএর মতই তাহার শরীরটা সরু এবং কোমলতা বর্জ্জিত। শরীরে শক্তির এক কণামাত্রও ছিল না।

তাহাকে বলিলাম "ভেতরে গিয়ে তোর মাজিকে বল যে একটা আদমি আয়া, তাকে দুটো-ভাত দিতে হবে।"

সে বলিল "মাজীকা খাওয়া তো আবি হইয়ে গিয়ে হোবে।"

আমি একটু রাগবশতঃ বলিলাম "তুই যানা পাজী। আর না হয় তুই একটু দাঁড়া, আমিই যাচ্ছি।"

ছক্কন দাঁড়াইল। সে লোকটা তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে।

তাহার দিকে ফিরিয়া ছক্কন বলিল "কারে তু কি চাস্, ভিক্ষা? আখুন হোবে না, হাত জোড়া আসে।"

"এই চুপ" বলিয়া দ্বার খুলিয়া আমিই বাড়ীর ভিতর যাইলাম, দেখি গৃহিণী তখন ঝিকে বাসনের চাকচিক্য বর্দ্ধিত করিবার গুপ্তমন্ত্রগুলি বলিয়া দিতেছেন।

আমি যাইয়াই বলিলাম, "ওগো আজ মহাষ্টমীর দিন একটা পুণ্য করতে হবে।"

মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন "ও! সে তুমি জান কি না, আমি ঝির সঙ্গে ৮টার সময় ঘোষেদের বাড়ী গিয়ে অঞ্জলি দিয়ে এসেছি।"

"তা বেশ করেছ। একটি অতিথি এসেছে, দুদিন তার খাওয়া হয় নি, দুটি ভাত চায় দিতে পার?"

এতখানি জিব কাটিয়া শ্রীমতী বলিলেন "একটু আগে বলতে হয়, প্রায় আধ হাঁড়ি ভাত ছিল, এখনও আধঘণ্টা হয়নি তাতে জল দিয়ে এলুম!"

"বেশ বলেছ। আধঘণ্টা আগে তো সে আর আমাকে টেলিগ্রাম করে নি যে আমার বাড়ী এসে ভাত খাবে। তা আচ্ছা, তাই সই, তাই বাড়, আমি বলে আসছি।"

"কে কোথাকার লোক" ইত্যাদি সকল কথা শুনিবার পূর্ব্বেই আমি আবার বাহিরে আসিলাম। লোকটি তখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে।

আমি ডাকিলাম, "রামচরণ!"

"আজ্ঞে।"

"বাপু, আমরা তো জানিনে, ভাতে এইমাত্র জল দেওয়া হয়েছে, খাবে তো?"

"কেন খাবনা বাবু, চাষার ছেলে আমরা তো জল দেওয়া ভাত খেয়েই মানুষ।" তার পর একটু থামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কি ব্রাহ্মণ ?"

"হ্যাঁ, আমার নাম শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়।"

লোকটা তখন আমার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। তাহার এইরূপ অতিভক্তি এবং অদ্ভূত হাবভাব দেখিয়া বাস্তবিকই আমার সন্দেহ ঘনীভূত হইতেছিল। আবার ভাবিলাম কোন ছদ্মবেশী ডাকাত নয় তো! এইরূপে কত ভিখারী সাধু সন্ন্যাসীর বেশে আসিয়া গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করে, এরূপ অনেক ঘটনাই তো শুনিয়াছি। একটা কিসের আশঙ্কায় প্রাণের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল।

ঝি বলিল "বাবু ভাত দেওয়া হয়েছে।"

ছক্কন বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহাকে বলিলাম, "যারে, ওকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আন, কলতলার রকে জায়গা করে দিগে যা।"

"উ আপনে যাগা করিয়ে লেবে, চলরে চল। ভাত বাড়া হইয়েছে" বলিয়া ছক্কন তাহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। আমি লোকটার অদ্ভুত প্রকৃতির কথা ভাবিতে লাগিলাম।

* * * *

"ললিত আছ হ্যা।"

"আছি এসো।"

প্রিয় বন্ধু শরৎ আসিল। তাহাকে দেখিয়া একটু সাহস হইল। কি জানি যদি হঠাৎ লোকটা ভোজালি টোজালি বাহির করিয়া বলে যে

দাও বাক্সের চাবি, নইলে এই ভোজালি—তখন শরৎ ছুটিয়া গিয়া থানায় খবর দিতেও ত পারিবে।

শরৎকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। সে সব কথা শুনিয়া বলিল "পাগল টাগল নয় তো?

আমি বলিলাম "খেপেছো? পাগলের প নেই তাতে, তবে জোচ্চোর টোচ্চোর হতে পারে।"

শরৎ বলিল "তা হতেও পারে, ওইরকম চাদর গায়ে দেওয়া একটা লোক গোয়ালন্দে যাব, পয়সা নেই, চাঁদা করে টিকিট কিনে দিন, এইসব বলে একবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে আমার কাছ থেকে একটা আধুলি ঠকিয়ে নিয়েছিল। যাক খুব সাবধান।" বলিয়া সে পকেট হইতে সিগার কেস বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইতে মনোসংযোগ করিল।

এমন সময় লোকটি আসিয়া বলিল, "বাঁচালেন বাবু আমাকে, এই কলকাতা সহরে কে কাকে খেতে দেয় বাবু! তার উপর আমি অজানা অচেনা লোক। বাড় বৃদ্ধি হোক বাবু, ভগবান মঙ্গল করুন। ওঃ!„ বলিয়া লোকটা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

শরৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল।

আমি বলিলাম "কৈ তুমি যে বলেছিলে খেয়ে এসে আমাকে সব বলবে, কি এইবার বল দেখি শুনি। তোমার চেহারা চালচলনে যেন বেশ ভাল লোক বলেই বোধ হচ্ছে। কোথায় বাড়ী তোমার? কলিকাতায় কে আছে?"

শরৎ বলিল "এখানে কতদিন এসেছো?"

আমি আবার বলিলাম "এখন কোথায় যাবে মনে করেছো?"

এতগুলি প্রশ্ন যদি এক সঙ্গে আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় আমাকেও বিচলিত হইতে হইত।

[৩]

"সবই বলছি বাবু আমার কথা যে রাবণের চিতে, এতো নিভ্‌বে না।" বলিয়া লোকটা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম "কেঁদ না রামচরণ, কেঁদ না, কি বলছিলে বল।"

"বাবু কাঁদবারও যো নেই, কাঁদতেও আর পারব না। তবে শুনুন বাবু—বসিরহাট মহকুমায় আমার বাড়ী। গ্রামের নাম আর বলিব না। আমার সবই ছিল বাবু, আরবছরও এমনি পূজার সময় দুই ভায়েতে এসে বেলগেছের কৃষ্ণমণ্ডলের আড়তে ৭০০৲ টাকার পাট বেচে গিয়েছি। আজ আমি পথের ভিখারী! কেন শুনবেন? আমার বাড়ীর ঠিক পাশেই আমাদের জমীদার বাবুর বাড়ী। চোদ্দপুরুষের ভিটা আমাদের, জমীদার বাবুর ইচ্ছা যে সেই ভিটা থেকে আমাদের উদ্বাস্তু করে সেখানে তাঁর গোলাবাড়ী করেন। সব গিয়েছে বাবু! আমার সবই গিয়েছে! সে ভিটাও গিয়েছে, এতদিনে গোলাবাড়ী হয়েছে, গোলায় ধানও উঠেছে বাবু! আর আজ আমি পথের ভিখারী।"

লোকটির চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। তখন ডাকাতের ভয় দূর হইয়া তাহার প্রতি আমার সহানুভূতি আসিয়াছিল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম "বলতে কষ্ট পাও, তবে না হয় থাক, আর বলতে হবে না। কারও মনে আঘাত দিয়ে কোন কথা আমি শুনতে চাই না।" রামচরণ বলিল "না বাবু বুক ফেটে মরে গেলেও বলবো। তবু জানবো যে আমার দুঃখের কথা বলতে বলতেই মরেছি। সেও আমার ভাল বাবু।"

"দুই ভাই আমরা, আমার লক্ষ্মণের মত ভাই, সেও আজ গিয়েছে। অদৃষ্টের দোষ বৈ কি!

"বাবুর বাড়ীর পাশেই বাস, কাজেই যখন তখন তাঁর ফাই-ফরমাস খাটতে হোত। আমারাও তাতে কিছু মনে না করে, প্রাণপণে কর্ত্তাম, তিনি মনিব, আমরা প্রজা, তিনি রাজা, আমাদের প্রতিপালক। কিন্তু কি কুক্ষণে যে আমাদের ভিটে জমীটুকুর উপরে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল বলতে পারি না, জমীটুকু তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্যে প্রায়ই আমাদের বলতেন, আমরাও তাতে রাজি হতাম না। শেষে ভয় দেখাতে লাগলেন কিন্তু তখনও আমরা ভয় পাই নি বাবু! যদি তখনও জানতাম যে শেষ এই দাঁড়াবে, তা'হলে জমী জমা ঘর দোর সব ছেড়ে দিয়ে বনে জঙ্গলেও বাস কর্ত্তে পার্ত্তাম। এখন আর তাও হবার যো নাই, এখন সবই গিয়েছে, বাবু, সবই হারিয়েছি।

"সে আরবছর কার্ত্তিক মাসের কথা। সন্ধ্যাবেলা দুই ভায়েতে ঘরের দাওয়ায় বসে আছি, হঠাৎ ২।৩ জন লোক, জমীদার বাবুর পাইক, বরকন্দাজ লাঠী সোটা নিয়ে এসে আমার গোয়াল থেকে গাই গরু, লাঙ্গলের গরু, সব খুলে উঠানে নিয়ে এলো। আদালতের একজন পেয়াদা সেখানে ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি? সে তো প্রথমে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলে, তার পর বললে যে জমীদার বাবু নাকি আমার নামে মোকর্দ্দমা করে ৩০০৲ টাকার ডিক্রী পেয়েছেন, সেই ডিক্রী জারি করে আমার গরু বাছুর ক্রোক করতে এরা এসেছে। রাগে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো। কি করবো কিছু বুঝতে পারলাম না। আমার ভাইকে সব কথা বল্লাম। সে গোঁয়ার গোবিন্দ মানুষ, অত শত বুঝিত না, সে একগাছা লাঠি নিয়ে একজন বরকন্দাজের ঘাড়ে বসিয়ে দিলে। তাতে যা হবার তা হোল। আমার ভাইকে তখনই তাঁরা বেঁধে ফেল্লে। সবই গেল বাবু। কবে নালিস হল তাও টের পেলাম না, সমনও পেলাম না, কবে ডিক্রী হোল তাও কিছু জানতে পারলাম না।

গরু বাছুর ত গেলই, তার উপর ভাইকে মার পিটের দায়ে বেঁধে নিয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে মহকুমায় ছুটিলাম। কিন্তু বাবু গরীব চাষার কথা কে শুনবে? ভাল মোক্তারেরা কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না, শেষে একটা ছেঁড়া মোক্তার দশ টাকা নিয়ে মকর্দ্দমা করলে, তাতো হোল কি জানেন মশাই, আমার ভাইয়ের তিনমাস জেল হল।"

শরৎ আমাকে বলিল "এরকম oppressive জমীদারের againstএ কোন steps নেওয়া হয় না? আশ্চর্য্য!"

"তার পর শুনুন বাবু। মাঘমাসে আমার ভাই যখন জেল থেকে ফিরে এলো তখন তার চেহারা সিকিখানা হয়ে গিয়েছে। দুই ভাইতে অনেকক্ষণ গলা জড়িয়ে কাঁদলাম। কিন্তু বাবু, বিপদ যখন মানুষের আসে তখন সে একা আসে না। জেলে থাকতেই আমার ভাইয়ের দুবার ব্যারাম হয়েছিল, জেলের হাসপাতালে থেকে দুবারই সেরে উঠেছিল, এবার আর তা হোল না। সে খালাস হয়ে ফিরে আসবার পর প্রায় ৭।৮ দিন পরেই তার জ্বর হোল, ঘটী বাটী বাঁধা দিয়ে ডাক্তার ডাকালাম, ডাক্তার এসে মুখ বেঁকিয়ে বল্লে ব্যারাম শক্ত। তিন দিনের দিন বিকার দাঁড়াল, তেরদিনের দিন আমার অমন ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেল!"

রামচরণ আবার কাঁদিতে লাগিল।

শরৎ বলিল "তার পর?"

"তারপর আরও অছে বাবু। বাড়ীতে ক্ষেত্তরের মা বলে এক বুড়ী ছিল, থাকিত ও কাজকর্ম্ম করিত। বাড়ীতে লোকের মধ্যে সে আর আমার পরিবার আর একটি ছোট ছেলে ছিল। আমার পরিবারের রূপ কৈবর্ত্তের ঘরের মেয়ের মত ছিল না। রাজরাণীর মতই ছিল। হাসিবেন না বাবু, যথার্থই তার রূপ রাজরাণীর মত ছিল।"

বাস্তবিকই শরৎ তখন গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিতেছিল।

"একদিন, সে এই ফাগুনমাসে, তখনও বেশ শীত ছিল, ভোরবেলায় উঠে আমি বসিরহাট গিয়েছিলাম। তার পরদিন ফিরলাম। ফিরে এসে যা দেখলাম ও শুনলাম, তাতে পাথর তো পাথর, আপনার ঐ জুতা জোড়াটা, এই ঘরের দেওয়াল, কড়িকাঠ দরজা সব কেঁপে উঠবে। সেই জমীদার, আমার রাজা, আমার প্রতিপালক সে নিঃসহায় পেয়ে—কি বলিব বাবু, বলবার কথা পাচ্ছিনে, আমার সর্ব্বনাশ করেছে। সতীসাধ্বী কলঙ্কের ভয়ে ক্ষেত্তরের মার কৌটা থেকে আফিং নিয়ে খেয়েছে। আমি যখন পৌঁছুলাম, তখন প্রায় তার শেষ অবস্থা, তার মুখ তখন কালী হয়ে গিয়েছে। সাধ্বী আমার দিকে কেবল এক বার চেয়ে বললে "কেষ্ট রইল, আমি চল্লাম।" বাবু সে কৈবর্ত্তের মেয়ে, কৈবর্ত্তের পরিবার। আমার সব গিয়েছে বাবু! ভাই গেল, পরিবার গেল, কেষ্ট, আমার সাত বছরের ছেলে কেষ্ট, তাকে বুকে করে আরও সাত আট মাস সেই ভাঙ্গা কুঁড়েয় পড়ে রইলাম। এইবার কি হোল জানেন বাবু! এবার ভগবানের প্যাঁচ, এবার আর জমীদার নয়, বসিরহাটে ওলাউঠা হোল, তাতে আমার বুকের নাড়ী ছিঁড়ে ফেল্লে, আমার কেষ্টকে নিয়ে গেল। সে আজ পনর দিনের কথা বাবু! পনর দিনের কথা! এখনও ওষুধ যায় নি! ঘর বাড়ী জমীজমা টাকাকড়ি যা কিছু ছিল সব ছেড়ে দিয়ে জমিদার বাবুকে একবার গিয়ে বল্লাম "বাবু সব খেয়েছেন এইবার ভিটেটুকুও খান, আপনার পেট ভরুক।" বাবু জমাদারকে হুকুম দিলেন "লাগাও জুতো।"

"ছুটে পালিয়ে এলাম। বরাবর হাঁটাপায়ে কলিকাতায় এসেছি। আজ আপনি দুটি ভাত দিয়ে বাঁচালেন। সব খেয়েও তবুও তো বাবু পোড়া খিদে যায় না!" বলিয়া লোকটা বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

আমারও মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। আমিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

শরৎ বিদায় লইয়া উঠিল। আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলিলাম "তারপর রামচরণ ?"

রামচরণ বলিল, "একবার কালীঘাটে যাব, মাকে দর্শন করে, মায়ের প্রসাদ পেয়ে, পারি তো একবার হাঁটা পথে কাশী যাব। বাবা বিশ্বেশ্বরকে একবার দর্শন করবো।"

আমি বলিলাম "না তুমি দিনকতক আমার এখানেই থাক, তার পর সুস্থ হয়ে কাশীতে যেও। পথখরচ আমিই দেবো।"

"না বাবু তা হবে না, আমি যাবোই, আমার যে ডাক পড়েছে।"

ভাবিলাম লোকটা যখন নাছোড়বান্দা তখন ইহাকে কিছু সাহায্য করি। এই ভাবিয়া বাড়ীর ভিতর যাইয়া ৫টি টাকা আনিলাম। তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "রামচরণ! এই ৫টি টাকা নাও। ৪৷৹ টাকা কাশীর রেলভাড়া, আর আট আনা রইল, জলখাবার টলখাবার কিনে খেও। আমরা সামান্য অবস্থার লোক, এর বেশী আর কোথায় পাব বল।"

রামচরণ বলিল "বাবু! আপনি আমার বাপ, এই কলিকাতায় যে দুয়ারে গিয়াছি সকলেই আমাকে তাড়িয়েছে। কাঙ্গালের দুঃখের কাহিনী আপনিই কেবল আজ শুনলেন। বাবু! টাকা রাখুন, টাকা আমি চাই না। আমি হাঁটাপথেই যাব। যদি দয়া করে দেন, তবে গোটাচারেক পয়সা দিন, যদি আবার পোড়া খিদের জ্বালায় মর্ত্তে হয়।"

আমি অনেক পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও সে টাকা কয়টি লইল না। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সে আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

ছক্কন বসিয়াছিল, সে বলিল "উঁ কৌন হ্যায় বাবু, পাগল আছে না ঠগ ?"

কি এক অজানিত আকর্ষণ এই অসহায় দরিদ্রের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে জানি না, তবে এখনও সময় পাইলে নির্জ্জনে বসিয়া সেই রামচরণের কথা ভাবি।

প্রায়শ্চিত্ত

[১]

বি, এ, পাশ করিলেও চাকরি জিনিষটা তত সুলভ নয়, তাহা কলেজ জীবন সমাপ্তির পর হরমোহন একদিনের জন্যও ভাবে নাই। যেদিন বি এ পাশের খবর বাহির হইয়াছিল, সেইদিন উত্তীর্ণ ছাত্রমণ্ডলীর তালিকার মধ্যে নিজ নামের সন্নিবেশ দেখিয়া তাহার হৃদয় যতটা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, এক মার্চেণ্ট আফিসের সাহেবের নিকট চাকরি প্রার্থী হইয়া উপেক্ষিত হওয়াতে তাহা ততোধিক দুঃখে ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে ভাবিল, ছিঃ এই চাকরির বাজার! এত দুর্দ্দশা!

ষ্টেটস্‌ম্যানে এক বিজ্ঞাপন ছিল যে একজন শিক্ষিত, কর্ম্মঠ, সুদশন বাবুর প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে। জামিন আপাততঃ কিছুই দিতে হইবে না। ষ্টেটস্‌ম্যান আফিসের বিজ্ঞাপন বিভাগের বাক্‌স বিশেষের নম্বরে দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে।

তীক্ষ্ণধার ছুরীর সাহায্যে বিজ্ঞাপনটীকে কাটিয়া লইয়া পরদিনই একখানি দরখাস্ত টাইপ করাইয়া খামে আঁটিয়া সেই অজানিত বাক্‌সের উদ্দেশে হরমোহন ডাকে ফেলিয়া দিল।

তিন দিন পরে উত্তর আসিল যে—আফিসের জয়েণ্ট সেক্রেটারী পরদিন ১টার সময় তাঁহার আফিসে তাহাকে দেখিলে আনন্দিত হইবেন।

হ্যাটকোট পরিহিত হরমোহন ১২টার সময়েই বাটী হইতে রওনা হইল। মাতাঠাকুরাণী তাহার ললাটে সিদ্ধির ফোঁটা দিয়া ঠাকুরের নিকট হরির লুট মানত করিলেন, কনিষ্ঠা ভগিনী খানিকটা তুলসীতলার মাটী তাহার কপালে ঘসিয়া দিল। রুমাল দিয়া তাহা পুঁছিয়া, পানের

পরিবর্ত্তে সেন সেন চিবাইতে চিবাইতে, সে যখন আফিসে পৌছিল, তখন ১টা বাজিতে আর পনর মিনিট বাকী।

ঠিক ঢং করিয়া একটা বাজিল, গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িল, আফিসের বাবুরা নিজ নিজ ঘড়ি মিলাইলেন, হরমোহনের শ্লিপও সাহেবের হস্তগত হইল। সাহেব সেলাম দিলেন। ছড়ি ও হ্যাট হাতে করিয়া হরমোহন সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিয়া সাহেবকে সেলাম করিল।

একথা ওকথার পর সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ম্যাট্রি-কুলেসন পাশ করিয়াছে কি না। তাহার উত্তরে সে জানাইল যে সে গ্র্যাজুয়েট এবং সে কথা তাহার দরখাস্তেও উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু পুনর্ব্বার যখন সাহেব ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে জ্ঞাপন করিলেন যে সে গ্র্যাজুয়েট কি না তাহা জানিবার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন তাঁহার নাই এবং সে ম্যাট্রিকুলেসন পাস করিয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও তাহার সঠিক উত্তর না দেওয়া তাহার পক্ষে ভদ্রোচিত কার্য্য হয় নাই, তখনই হরমোহনের ধৈর্য্য সীমাচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

যাহা হউক বিনীতস্বরে হরমোহন পুনর্ব্বার জানাইল যে সে কলিকাতা ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ বি এ পাশ করিয়াছে, এবং সেই কথাই সে সাহেবকে ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছে।

গম্ভীরভাবে সাহেব জানাইলেন যে তাহার ন্যায় বাবুকে তিনি যে তাঁহার আফিসে স্থান দিতে পারিলেন না সে জন্য তিনি দুঃখিত। তাঁহার মত সাহেবের নিকট একজন বাঙ্গালী যুবকের 'গ্র্যাজুয়েট' শব্দের অর্থ বুঝাইতে প্রয়াস পাওয়া সাহসের কার্য্য হইলেও তাহা অমার্জ্জনীয়।

ইহার উপর আর কথা চলে না। সুতরাং সেলাম করিয়া হরমোহন বাহির হইল। চাপরাসী বকশিশ চাহিল। কিন্তু সে দিকে দৃকপাতও

না করিয়া বরাবর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল ;—একেবারে ট্রামে উঠিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল যে চাকরি আর সে করিবে না ! তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত তখন লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মাতা অনেক বুঝাইলেন, ভগিনী অনুনয় করিল হিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধগণ ভৎ'সনা করিলেন, বন্ধুগণকে দিয়াও অনেক অনুরোধ করান হইল,—তথাপি সে টলিল না, ভীষ্মের মত অবিচলিত রহিল।

ক্রমে একমাস, দুই মাস গেল। কিন্তু তাহার সেই এক কথা, না খাইয়া মরিলেও চাকরি আর করিবে না। যে গ্র্যাজুয়েট কাকে বলে জানে না, তারই অধীনে চাকরি ! 'তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।'

ভগিনীর শ্বশুর আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "তা মার্চ্চেণ্ট আফিসে না হোক গভর্ণমেণ্টের চাকরির চেষ্টাও তো করলে হোত। লোকে কি আর চাকরি করে খাচ্চে না ?"

"বুঝতে পাচ্ছেন না তালুই মশাই—"

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন "খুব বুঝতে পেরেছি বাবা। বেই মশায় নেই, এখন সংসারের ভার তোমার উপর তা বুঝছ ? এ কটা বছর যেন না খেয়ে না দেয়ে গহনা বেচে বেনঠাকরুণ পড়ার খরচ সংসার খরচ সবই চালিয়ে এলেন, এখন ?"

"আমি ভাবছি হয় বিলাত না হয় আমেরিকা, না হয় জাপান যাব।"

হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "বেনঠাকরুণ, কবিরাজ দেখান, বাবাজির মাথায় একটু বিকৃতি হয়েছে।"

হরমোহনের মনে একেই অগ্নি জ্বলিতেছিল, এই মন্তব্যে তাহাতে ইন্ধন সংযুক্ত হইল।

মাতা বলিলেন, "সেই কবে কোন সাহেব কি বলেছে, তাই বলে

যে একেবারে চাকরিই করবি নে তার মানে কি ? লেখাপড়া শিখে, পাশ করে লোকে কি এমনি করেই বাঁদর হয় ?"

ক্ষুণ্ণস্বরে হরমোহন বলিল "মা আমি বিলাত যাব !"

"যা খুসী তাই কর বাপু ; বেই যে বলে গেলেন মিছে নয়, তোর মাথাই খারাপ হয়েছে বটে। পাগলা কোথাকার! লেখাপড়া শিখলি, ভাবলুম কোথায় একটা মানুষ হয়ে-চাকরি করবি, তা নয় এ কি সব পাগলের পাগলামি।"

[২]

কথাটা যে বাস্তবে পরিণত হইবে তাহা কি কেহ ভাবিয়াছিল ? হঠাৎ একদিন হরমোহন নিরুদ্দিষ্ট হইল। মাতা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইলেন, ভগিনী ভাবিলেন মাথা খারাপ মানুষ—হয়ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে খোঁজ করা হইল, কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলিল যে তাহারা কোন খবরই রাখে না। হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া রাস্তার চতুঃপার্শ্বে, ট্রামের থামে আঁটিয়া দেওয়া হইল, বেঙ্গলী ও হিতবাদী উভয় পত্রিকাতেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কিন্তু তিনদিন চারিদিন করিয়া এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তথাপি কোন উদ্দেশ মিলিল না। মাতা যোড়করে কালীঘাটে পূজার মানত করিলেন, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইলেন, তথাপি হরমোহনের সন্ধান মিলিল না।

যে যাহাই বলিল, তাহাই করা হইল, কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি রহিল না। এক জ্যোতিষীর নিকট গণনা করান হইল, তিনি সবিশেষ গণনা করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন "তোমার ছেলে হৃষীকেশে সন্ন্যাসী সাজিয়াছে।"

হরিদ্বারে এক পরিচিত ব্যক্তি রেলে কাজ করিতেন। তাঁহাকে

টেলিগ্রাম করা হইল, চিঠিও লেখা হইল। এক সপ্তাহ পরে তিনি উত্তর দিলেন যে সেখানকার সন্ন্যাসী সাগর মন্থন করিয়া হরমোহনরূপ রত্ন উদ্ধার করা একান্তই দুরাশা।

পনের দিন পরে বোম্বাই হইতে এক পত্র আসিল। মাতাকে অশেষ-বিধ সান্ত্বনা বাক্য দিয়া শেষে হরমোহন লিখিয়াছে যে ঘড়ী ঘড়ীর চেন, আংটি প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া, এবং অন্য উপায়ে চেষ্টা করিয়া যাহা কিছু অর্থের সংস্থান হইয়াছে তাহাতে সে ডেক প্যাসে-ঞ্জার হইয়া বিলাত রওনা হইল। চিন্তার কিছুমাত্র কারণ নাই, অল্পকাল মধ্যেই সে মানুষ হইয়া ফিরিবে।

হতভাগিনী মাতা যখন নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পত্র পাইলেন, তখন হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সপুত্র জাহাজ তখন আরব্যসাগরে। বাটীতে মহা ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

[৩]

'বিলাত দেশটা মাটীর' এই গানটী কেবল শোনা নহে, হরমোহন নিজেও অনেকবার গাহিয়াছে। অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া, যখন নিরা-পদে সে লণ্ডনের জনসমুদ্র মাঝে অবতরণ করিল, তখন বিলাতের রঙ্গীন নেশাটা তাহার অনেক পরিমাণে ছুটিয়া গিয়াছে। নিঃসহায় এবং অর্থ-হীন অবস্থায় এ সাগরে পাড়ি জমানো যে অসম্ভব তাহা সে এতদিন পরে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। পুত্রহারা জননীর মুখচ্ছবি মনে করিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাহার সহপাঠী এক বন্ধু ব্যারিষ্টার হইবার আশায় কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনে আসিয়াছিল। তাহার ঠিকানাও জানা ছিল—অকূল সমুদ্রে কূল পাইবার আশায়, অনেক ঘুরিয়া, অনেক খুঁজিয়া সে যখন বেজওয়া-

টারে বন্ধুবরের নিকট উপস্থিত হইল, তখন বন্ধুবর যে কেবল বিস্মিত হইল তাহা নহে, যৎপরোনাস্তি আনন্দিতও হইল।

অবশেষে সে বলিল, "তা বেশ হয়েছে হরা—তুই এসেছিস ! আমি ত ভাই এখানে থেকে থেকে বাংলা ভাষাটা একরকম ভুলেই যাচ্ছিলাম, এখন তবু তোর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে বাঁচব।"

হরমোহন তাহার জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস ও বৈরাগ্যের কারণ বিবৃত করিল। বন্ধুবর সহাস্যে করতালি দিয়া বলিল "Bravo !"

কিন্তু দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার চলে কি করিয়া ? মৌখিক মিষ্টালাপে তো লণ্ডনের ন্যায় সহরে একজন ভদ্রলোকের উদরপূর্ত্তি হয় না ! প্রায় দিন পনের পরে বন্ধুবর যখন দেখিল যে তাহার পিতৃপ্রেরিত অর্থে এরূপ আতিথেয়তা করা ঘোর অমিতব্যয়িতার পূর্ব্বলক্ষণ, তখন একদিন সে স্পষ্টই হরমোহনকে বলিল "হরা, এখন কি করবি ভাবছিস্।"

"কিছুই তো ভাবি নি,—"

"কি রকম ? তবে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এতটাকা খরচ করে, গুরুজনের মনে কষ্ট দিয়ে বিলাতে এলি ?"

"ঐ যা বলেছি, একটা ভয়ানক বৈরাগ্য এসে উপস্থিত হোল।"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত বন্ধুবর বলিল, "Hang your বৈরাগ্য। একটা কিছু কাজ তো করা চাই ! ব্যারিষ্টারী পড়বি ? কিন্তু তাতেও দেড়টা হাজার টাকা প্রথমে চাই। কি বলিস্ ?"

"না, আমার উদ্দেশ্য একটা স্বাধীন ব্যবসা কিছু শেখা।"

"তবে কি করবি ভাবছিস ? একটা যা হয় কিছু বল।"

হরমোহন তখন বড়ই কাতর স্বরে বলিল, "আমি তো ভাই কিছুই জানিনা, তুমিই যা হয় একটা কিছু উপায় করে দাও। এখন ভাবছি মাকে কাঁদিয়ে পালিয়ে আসাটা খুবই অন্যায় হয়েছে।"

বেকার অবস্থায় থাকিয়া বন্ধুর পিতৃপ্রেরিত অর্থ ধ্বংস করিতে তাহারও বড় লজ্জা বোধ হইতেছিল।

বন্ধু বলিল "নিশ্চয়ই! তা আর বল্‌তে!"

কিয়ৎকাল চিন্তার পর সে বলিল "দেখ হরা! একটা কাজ করতে পারিস্ তো আমি বলি। এখানকার থিয়েটার পাগলা যারা তারা Indian classics ভারি পছন্দ করে। এই সে দিন লিটল্ থিয়েটারে বুদ্ধদেব প্লে হয়ে গেল,—ওরে বাপরে, সে লোকের কি ঠেলাঠেলি! তুই এক কাজ কর। ভাল ভাল বাংলা নাটকের ইংরাজী তরজমা করে দে, আমি বরং চেষ্টা করে একটা থিয়েটারে তোকে introduce করিয়ে দেব।"

আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভাসমাণ তৃণ দেখিয়া কলম্বসের মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, বুঝি হরমোহনের আজ ততোধিক আনন্দ হইল।

সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "বেশ বলেছিস ভাই, তাই করবো। কি বই তরজমা করা যায় একটা ভাব দেখি।"

অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর স্থির হইল যে "কালাপাহাড়" অনুবাদ করা হইবে।

হরমোহন বলিল "তা তো হোল, কিন্তু এখানে বই কোথা পাব?"

"কুছ পরোয়া নেই। বৃটিশ মিউজিয়ম থেকে বই আনিয়ে দেবো।"

সে দিন বৃহস্পতিবার। 'বিদ্যারম্ভে গুরুশ্রেষ্ঠ' এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া হরমোহন সেই দিনই "কালাপাহাড়" ভাষান্তরিত করিতে আরম্ভ করিল।

[৪]

'কালাপাহাড়ে'র অনুবাদ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিলেন। গ্রহ সুপ্রসন্ন হইলেন, হরমোহনের Iconoclast এর খুব পসার হইল। তৃতীয় অভিনয় রজনীতে এমন ভিড় হইল যে রঙ্গালয় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ম্যানেজার স্বয়ং আসিয়া হরমোহনের করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে আনন্দ সম্ভাষণ করিয়া গেলেন। ইহাতে তাহার যে অর্থের সংস্থান হইল, তাহাতে সে বন্ধুবরকে ধন্যবাদ দিয়া অন্যত্র বাসা করিল।

উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া সে গিরিশবাবুর "জনা"র অনুবাদ করিল। ভাগ্যদেবী এবারও সুপ্রসন্না হইলেন, লিট্‌ল থিয়েটারের ম্যানেজার আসিয়া তাহাকে মাসিক কিছু বৃত্তি দিয়া বাংলা নাটকের তরজমা করিবার চুক্তিপত্র লেখাইয়া লইলেন।

মাস তিনেকের মধ্যে পাঁচখানি নাটক সে প্রকাশ করিল। যে দিন 'প্রতাপাদিত্য' অভিনীত হইল, সে দিন সহরে বোধ হয় আর লোক ছিল না। তাহাতে যে কেবল অর্থলাভ হইল তাহা নহে, আরও যাহা লাভ হইল, তাহার জন্য তাহাকে পরে একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

থিয়েটারের এক অভিনেত্রী বঙ্গীয় যুবকের এই কৃতকার্য্যতায় মুগ্ধ হইল। ক্রমে ঘনীভূত আলাপ যখন প্রণয়ে পরিণত হইল, তখনও ইহার মধ্যে কেহ নিতান্ত অসঙ্গত কিছু দেখিল না, কারণ এরূপ ব্যাপার ইংলণ্ডে সচরাচর ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যে দিন শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ কার্ড বিতরিত হইল, সে দিন নূতন ও পুরাতন উভয় শ্রেণীর বন্ধুগণই যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

অভিনেত্রী "ম্যাবেলে"র সহিত হরমোহন রায়ের শুভ পরিণয় সংঘটিত হইয়া গেল। বধূও থিয়েটারের খাতায় নাম কাটাইল।

সেই দিন হরমোহনের বিলাত প্রবাসের একবর্ষ পূর্ণ হইল।

* * * * *

স্বামী স্ত্রীতে কয়েকমাস বেশ সুখেই কাটিল। অকস্মাৎ হরমোহনের জীবন বসন্তকুঞ্জে তুষারপাত হইল কি না জানি না, কিন্তু মিসেস্ রায় একদিন প্রস্তাব করিলেন যে ইংলণ্ড ছাড়িয়া তাঁহারা ভারতে আসিয়া কলিকাতায় জঘন্য থিয়েটারগুলিকে পদদলিত করিয়া সম্পূর্ণ বিলাতী সাজে, বিলাতী কায়দায় এক দেশী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিবেন,—আর তাহার নাম হইবে 'প্যারাডাইজ থিয়েটার',—স্বর্গের মতই তাহা মনোহর ও নয়নারাম, কল্পনা ও ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

বিবাহের ঠিক ছয়মাস পরেই কলিকাতায় 'কন্টিনেণ্টাল হোটেলে'র খাতায় মিষ্টার ও মিসেস্ রায়ের নাম রেজেষ্ট্রী হইল।

হরমোহন থিয়েটার খুলিবার জন্য উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিল।

[৫]

"ওমা! দাদা এসেছে গো!"

"কই বাবা আমার! এসেছিস্ ফিরে! আয় বাবা!"

জননী আছড়াইয়া পড়িলেন। হ্যাট কোট পরিহিত হরমোহন সম্মুখে দাঁড়াইয়া রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতেছিল।

"এতকাল কোথায় ছিলি বাবা আমার! আমার যে ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে মস্ত রোগ দাড়িয়ে গিয়েছে।"

ভগ্নী সেই খানেই দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল "মার কি আর সে শরীর আছে? কেবল দিনরাত কান্না। একেবারে এমনি করেই কি ভুলে থাকতে হয় দাদা!"

"দূর পাগলি ভুলবো কেন?" বলিয়া হরমোহন চিরপরিচিত তক্ত-পোষখানির উপর বসিল।

যখন সে তাহার বৈচিত্র্যময় প্রবাস কাহিনী বলিতেছিল, মাতাপুত্রী উভয়েই তখন নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছিলেন। তারপর যখন ম্যাবেলের সহিত বিবাহের কথা শুনিয়া শোকতাপক্লিষ্টা আতুরা জননী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তখন হরমোহন একটু চঞ্চল হইল।

"হ্যাঁ দাদা, তোমার মনে শেষে এই ছিল? শেষটা থিয়েটারের একটা বিবি নাচউলী বিয়ে করে নিয়ে এলে!" বলিয়া ভগ্নী শুশ্রূষা দ্বারা জননীর চৈতন্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মুখে চক্ষে হরমোহনের প্রতি একটা তীব্র ভর্ৎসনা ও ঘৃণার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল।

অনেক স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া হরমোহন যখন হোটেলে ফিরিল তখন রাত্রি ৮॥০ টা বাজিয়া গিয়াছে। খানসামা ডিনার আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল,—কিন্তু তখনও মেম সাহেব ফেরেন নাই। টিফিনের পরেই তিনি 'সপিংএ' বাহির হইয়াছিলেন।

৯॥০ টার সময় সপিং প্রত্যাগত মেমসাহেব কতকগুলি জিনিষপত্র সহ আসিয়া হরমোহনকে জানাইলেন যে তাঁহাদেরই থিয়েটারের একজন দক্ষ অভিনেতা নিজে এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া গ্রাণ্ড অপেরা হাউসে সদলবলে অভিনয়ার্থে আসিয়াছেন। চৌরঙ্গীতে তাঁহারই সহিত দেখা হওয়ায় গল্প গুজব এবং অতীত কাহিনীর চর্চ্চায় যে এত রাত্রি হইয়াছে তাহা তাঁহার মোটেই খেয়াল ছিল না।

হরমোহন কিন্তু মনে মনে ভারি বিরক্ত হইল। কিন্তু উপর্য্যুপরি ২।৩ দিন ঐ রকম বেশী রাত্রি করিয়া অবশেষে যখন একদিন মেমসাহেব আদৌ গৃহে ফিরিলেন না, তখন হরমোহন যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইল। ঘৃণায় ও বিরক্তিতে সে তাহার সন্ধানও লইল না। তাহার মনে তখন

অনুতাপের আগুন জ্বলিতেছিল। মনোযন্ত্রণায় সে সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন 'ডেলী নিউস্' পড়িতে পড়িতে থিয়েটারের সমালোচনার কলমে সে পড়িল যে গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসে যে বিলাতী কোম্পানী কয়েক মাস যাবৎ অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহারা গত রজনীতে যেরূপে "ম্যাকবেথ" অভিনয় করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই তুলনারহিত। এবং এরূপ সুচারুভাবে ম্যাকবেথ অভিনীত হইবার অন্যতম কারণ এই যে, বিলাতের যে সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী 'মিস ম্যাবেল' প্রায় একবৎসর কাল 'অজ্ঞাতবাসে' ছিলেন, তিনি এতদিনে স্বীয় অজ্ঞাত বাস পূর্ণ করিয়া কলিকাতায় আত্মপ্রকাশ করিয়া গত রজনীতে "লেডী ম্যাকবেথের" ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। কলিকাতাবাসীর দুর্ভাগ্য যে উক্ত কোম্পানি সদলবলে আগামী সপ্তাহেই জাপান রওনা হইবেন। সুতরাং ম্যাকবেথ দর্শনার্থী নাট্যামোদীগণের ইহাই শেষ সুযোগ—

ঘৃণায়, লজ্জায় ও ক্রোধে সে কাগজখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। আরও কি লেখা ছিল, কিন্তু তাহা আর পড়িতে প্রবৃত্তি হইল না।

[৬]

সেই দিনই হ্যাটকোট ছাড়িয়া, ধুতি চাদর পরিয়া, দ্বিপ্রহরে হরমোহন আসিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইল। মাতাপুত্রের অশ্রুতে উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল।

প্রায় ১০।১২ দিন পরে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে গ্রাণ্ড অপেরা হাউসের ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধা অভি-নেত্রীর 'সুসমাচার' জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে তিনি জানাইলেন যে

"মিস" ম্যাবেলের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সৌভাগ্য তিন দিন পূর্ব্বে আসিলেই হইতে পারিত। কারণ দুইদিন পূর্ব্বে সে কোম্পানি সদলে জাপান যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসের ষ্টেজ ভাড়া লইয়াছিলেন মাত্র, সুতরাং তিনি অধিক সংবাদ কিছু রাখিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই।

নতমুখে হরমোহন চলিয়া আসিল। সেই দিনই সমস্ত বৃত্তান্ত বিলাতে তাহার ভাবী ব্যারিষ্টার বন্ধুকে লিখিল। উপসংহারে লিখিল, "আমার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, এইবার মাথা মুড়াইব।"

উত্তরে বন্ধুবর লিখিলেন "যদি নালিস করিতে চাও, আমি সে ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি, তুমিও কোন উকীলের পরামর্শ লইতে পার, কিন্তু আমি বলি আর কেলেঙ্কারীতে কাজ নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ, বেশ হইয়াছে। মাথা মুড়ানর ব্যবস্থাও মন্দ নয়, তবে একটু ঘোল ঢালিও, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ঘোল অনেক কঠিন রোগের বীজাণু নষ্ট করে।"

হরমোহন মাথা মুড়াইয়াই হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করিল। কিন্তু মাতা ও ভগ্নীর অশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও বিবাহ আর করিল না।

সমাপ্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেবার গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন খোলা হইতেছিল, সুতরাং কথাটা বড় বেশী দিনের নয়।

চৌধুরীবাঁধ এবং ইস্‌রি এই উভয় স্থানের কার্য্যভার লইয়া আমি ছিলাম, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং শশাঙ্ক ছিল আমার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। কেরাণী, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার এবং বন্ধু, এই ত্রিমূর্ত্তিতে সে আমার প্রবাসের সহচর ছিল, নচেৎ সেই পার্ব্বত্যদেশে, কুলীর রাজ্যে, পাহাড় কাটিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া বাঘ ভালুকের ভয় শিয়রে করিয়া কতদিন থাকিতে পারিতাম বলিতে পারি না।

শশাঙ্ক ব্যতীত এই প্রবাসে আমার আর একটী বিশ্বাসী লোক ছিল, সে আমার আরদালী ফকীরুদ্দীন।

এই ফকীরুদ্দীন লোকটীর যে বয়স কত, তাহা তাহার চেহারা দেখিয়া অনুমান করিবার যো ছিল না। তাহার আবক্ষলম্বিত কাঁচা পাকা দাড়ী দেখিলেই তাহার বয়স পঞ্চাশের উপর বলিয়া মনে হইত, কিন্তু তাহার দেহে সিংহের ন্যায় শক্তি ছিল, পাঞ্জা লড়িয়া সে আমার দলের সর্ব্বাপেক্ষা বলবান কুলীকেও হারাইয়া দিয়াছে। আমার একাদশ বর্ষীয় পুত্র সুকুমার ওরফে খোকা তো ফকীরউদ্দিন বলিতে একেবারে অজ্ঞান, ফকীরও তাহাকে আন্তরিক স্নেহ করিত, আমিও এই বলবান আর্দ্দালী-টির হস্তে ছেলে মেয়ে রাখিয়া এই ভীতিসঙ্কুল পার্ব্বত্যদেশে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতাম। এইরূপে দিনগুলি একরকমে কাটিয়া যাইতেছিল।

যে দিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন প্রভাত হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল। আফিস ঘরের বারান্দায় একখানি ডেকচেয়ারে বসিয়া আমি একখানা পুরাতন খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে শশাঙ্ক একখানি চিঠি লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল, "ওহে, এই দেখ সামনের ওই বড় পাহাড় কাটবার স্যাংসেন এসেছে।"

চিঠিখানি পড়িয়া বুঝিলাম তাহার কথা যথার্থই বটে। সেখানি তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম, "তবে আর কি, লেগে যাও এবার। আজই কাজ স্বরু করে দাও।"

"নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে ওই গুহাটার জন্যে। পোড়া রেলের জন্যে এতদিনকার একটী কীর্ত্তি নষ্ট হয়ে যাবে! যে গুহায় একদিন স্বয়ং বুদ্ধদেব, অথবা স্বয়ং পরেশনাথ—"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "থাম থাম, তোমার প্রত্নতত্ত্ব শুনতে শুনতে কোনদিন হয়তো ইঞ্জিনিয়ারি ছেড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক হয়ে যাব।"

আমাদের বাংলো হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী বিরাট পাহাড় ছিল, তাহারই ভিতর একটী গুহা শশাঙ্ক আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আমিও একদিন যাইয়া তাহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। পাহাড় কাটিয়া গুহাটী করা, তাহার দ্বার অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাহার দেওয়ালগুলি আশ্চর্য্যরূপে কাঁচের মত পালিস করা। অতীতের এমন সুন্দর কীর্ত্তিটী ধ্বংস হইয়া যাইবে, সেজন্য আমারও মনে বড় দুঃখ হইতেছিল, কিন্তু কি করিব উপায় নাই।

শশাঙ্ক বলিল, "চল না হে, আর একবার গুহাটাকে দেখে আসা যাক, দোরগোড়ায় একখানা পাথরে কি সব কতকগুলো লেখা আছে, সেখানা খুলে নিয়ে যদি মিউজিয়মে পাঠাতে পারা যায় তা হলে—"

বাহিরে তখন ঝম্ ঝম্ করিয়া দৃষ্টি পড়িতেছিল, আমি বলিলাম,

"পাগল হয়েছ না কি হে। এই বৃষ্টিতে যাবে গুহা দেখতে! এত সখ আমার প্রাণে নেই। তুমি বরং সেই গুহার মধ্যে ডিনামাইট টাইট সব ঠিক করে তোমার বাংলো পর্য্যন্ত ব্যাটারি ফিট করে এসো, রাত্তির ৮৷৯টার মধ্যে পাহাড়টাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে এখন। হেড আফিসের স্যাংসেনের অভাবে কুলীদের কাজ বন্ধ রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। এখন ওসব ছেলেমানুষী করবার সময় নয়, বুঝলে?"

শশাঙ্ক তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণে মেঘ কাটিয়া গিয়া আকাশ দিব্য ফরসা হইল। রৌদ্র উঠিল। বর্ষা অন্তে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য যে কতখানি সুন্দর হইল তাহা আমি নীরস একজিকিউটিভ এনজিনিয়ার, কিরূপে বর্ণনা করিব। তবে এক কথায় বলিতে পারি যে, সে দৃশ্যের তুলনা নাই।

শশাঙ্ক অপরাহ্ণের পূর্ব্বেই আসিয়া খবর দিল যে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছে, গুহাটির মধ্যে ডিনামাইট স্থাপিত করা হইয়াছে, ইলেক্‌ট্রিক তার তাহার আফিসের গ্যালভ্যানোমিটারের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, এখন আমি একবার দেখিয়া অনুমোদন করিলেই সে ঠিক রাত্রি ৮টার সময় ব্যাটারী চার্জ্জ করিবে।

পাঁচ ঘণ্টার কার্য্য এক ঘণ্টায় করিবার ক্ষমতা যে শশাঙ্কের ছিল তাহা আমি জানিতাম, সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যেই সে সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে শুনিয়া আমি কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করিলাম না। হ্যাটটা মাথায় দিয়া বলিলাম "চল"।

পাহাড়ের উপর উঠিয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া, কার্য্য সম্বন্ধে শশাঙ্ককে উপদেশ দিয়া যখন বাংলোয় ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আমি বারান্দায় উঠিবামাত্র গৃহিণী অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত বলিলেন "হ্যাঁ গা, খোকা!"

পূর্ণ বিস্ময়ের সহিত আমি বলিলাম "খোকা কি আবার?"

"খোকা কোথায় গেল, তাকে যে দেখতে পাচ্ছি না, বিকেল থেকে।" আমি চমকিত হইলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ভয়ঙ্কর মেঘ করিয়াছে, আমার বাংলোর দেওয়ালে টাঙ্গানো ব্যারোমিটারে পারদ অনেকখানি উঠিয়াছে। বুঝিলাম ভয়ঙ্কর ঝড় আসিবে। বলিলাম "পাহাড়ে টাহাড়ে ওঠেনি তো? যদি পথ ভুলে গিয়ে থাকে তবেই ত সর্ব্বনাশ! আকাশের দিকে চেয়ে দেখছো, কি রকম ঝড় আসছে।"

গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। কোনরূপে তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া— আমি চারিদিকে ১০।১২ জন কুলী পাঠাইলাম।

একঘণ্টা গেল, দুইঘণ্টা গেল, প্রতি মিনিটেই আমার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতেছিল। চারিদিকের পাহাড়ে সহজ অবস্থায় দিনের বেলায় কুলীরাও সময়ে সময়ে পথ ভুলিয়া যায়, সুতরাং এই অন্ধকারে ঝড়ের সময় ছেলেমানুষ যে কোথায় গেল তাহা ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম না। বাহিরে ঝড়ও তখন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে।

কুলীরা একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, মানুষের গম্য পথ যতগুলি ছিল, তাহা তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু খোকাবাবুকে কোথাও পাওয়া যায় নাই।

আমার স্ত্রী তো বিষম কান্না জুড়িয়া দিলেন, আমিও যে অধীর না হইলাম এমন নয়।

শশাঙ্কের বাংলাতে একজন কুলী পাঠাইলাম, সেও অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, খোকা সেখানে নাই!"

আমি অধীরভাবে বলিলাম "দেখ তো ফকীরউদ্দীন কোথায়?

কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ফকিরুদ্দীনকেও পাওয়া গেল না।

এই সময় একজন কুলীর সর্দ্দার আসিয়া আমাকে জানাইল যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে খোকাবাবুকে এবং ফকীরুদ্দীনকে পাহাড়ের উপর গুহার দিকে যাইতে দেখিয়াছে। উক্ত সর্দ্দার তখন পাহাড় পার হইয়া তাহার বাড়ী যাইতেছিল, এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়া শুনিল যে খোকাবাবুকে পাওয়া যাইতেছে না, সেকারণ সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আমাকে খবর দিতে আসিয়াছে।

"পাহাড়ের গুহায়?" আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, কপাল দিয়া দর দর করিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। হাতের রিষ্ট ওয়াচে দেখিলাম যে রাত্রি ৮টা বাজিয়া পনের মিনিট।

পাগলের ন্যায় ছুটিয়া সেই অন্ধকারে বাহির হইলাম। একটা কুলী লণ্ঠন লইয়া আমার পশ্চাতে ছুটিল। শশাঙ্কের অফিসঘরে আসিয়া দেখিলাম দ্বার বন্ধ, ভিতরে আলো জ্বলিতেছে। দ্বারে এক লাথি মারিলাম, ভিতরে কতকগুলি কাঁচের বাসন ঝন ঝন করিয়া পড়িয়া গেল।

মুহূর্ত্তমধ্যে শশাঙ্ক আসিয়া দ্বার খুলিয়া আমাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি হে কি ব্যাপার!"

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "ডিনামাইট বসিয়েছিলে কোথায়?"

শশাঙ্ক কিছু বুঝিতে পারিল না, বলিল "গুহার বাইরেই একজায়গায় মাটী পেলাম, সেইখানেই পুঁতেছি।"

অধৈর্য্যভাবে আমি বলিলাম "ব্যাটারী চার্জ্জ করেছ?"

শশাঙ্ক অবিচলিতভাবে বলিল "হ্যাঁ, এইমাত্র বোতাম টিপেছি। বোধ হয় কোথাও কিছু খারাপ হয়ে থাকবে। এখনও তো explosion হোল না।"

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "বোতাম টিপেছ! রাস্কেল কোথা-কার! তোমাকে আমি খুন করবো!"

আমি তখন এত উত্তেজিত হইয়াছিলাম যে এখনও সে কথা মনে হইলে গা কাঁপিয়া উঠে।

শশাঙ্ক কিছু বুঝিতে পারিল না। সেই বৃদ্ধ কুলীর সর্দ্দার তাহাকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলিল। আমার বাকশক্তি তখন একেবারেই লোপ পাইয়াছিল।

ব্যাপার শুনিয়া শশাঙ্ক মুহূর্ত্তের মধ্যে দশ পনের জন কুলীকে গাঁতি, কোদাল, শাবল, লণ্ঠন প্রভৃতি লইয়া আসিতে বলিয়া আমার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া সেই পাহাড় অভিমুখে চলিল। বৃষ্টিতে উভয়ের সর্ব্বাঙ্গে ভিজিয়া গেল।

গুহার নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, প্রবল ঝড়ে উপর হইতে একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে ঠিক গুহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং গুহার দ্বার তদ্দারা প্রায় আবদ্ধ। ব্যাটারির সহিত যে ইলেট্রিকের তার পাহাড় উড়াইবার জন্য যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেটি সেই পাথরের চাপে ছিঁড়িয়া বহুনিম্নে পড়িয়া গিয়াছে।

কুলীরা অল্প সময়ের মধ্যেই সেই প্রস্তরখণ্ড সরাইয়া গুহার দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। আলো লইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ ফকীরুদ্দীন পড়িয়া আছে, রক্তে তাহার হাতও কাঁধের জামা ভিজিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও সে দুই হস্তে খোকাকে বুকে চাপিয়া আছে। একটা পাহাড়ী সাপ মরিয়া রক্তাক্ত কলেবরে অনতিদূরে পড়িয়া আছে।

আমি ডাকিলাম 'খোকা।'

খোকা কাঁদিয়া উঠিল। ফকীর চোখ মেলিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল,

কিন্তু পারিল না। তাহার ক্ষত স্থানগুলি হইতে তখন প্রবল রক্তস্রোত পড়িতেছিল।

খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলাম।

কুলীরা ফকীরকে ধরাধরি করিয়া নীচে নামাইল। বাংলোয় আসিতে আসিতেই ফকীর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তাহার জামাকাপড় খুলিয়া, তাহার ক্ষতস্থানগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া তাহার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে আমি কুলীগণকে অনুরোধ করিলাম। খোকার জননী খোকাকে পাইয়া বুকে করিয়া লইলেন।

ঘামে ও বৃষ্টিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া গিয়াছিল, জামাকাপড় বদলাইয়া বাহিরে আসিবামাত্র শশাঙ্ক আমাকে বলিল "ওহে তোমার ফকীর একজন ছদ্মবেশী ফকীর।"

তাহার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম "কি রকম ?"

"দেখবে এসো। তার ঐ যে পাকা দাড়ী গোঁফ, সব পরচুলের। কিন্তু লোকটা এমনি কায়দায় সেগুলো পরতো যে আমরা একদিনের জন্যেও তা বুঝতে পারে নি।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া শশাঙ্কের সহিত বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, ফকীরুদ্দীনের জ্ঞান হইয়াছে। সে উঠিয়া বসিয়াছে। তাহার গোঁফ দাড়ি কিছুই নাই, শ্মশ্রুগুম্ফহীন এই ব্যক্তিটীকে দেখিলে বিংশবর্ষীয় যুবাপুরুষের অধিক বলিয়া বোধ হয় না।

হারিকেন লণ্ঠনটা তাহার মুখের উপর তুলিয়া বলিলাম "এ সব কি ফকীর ?" সে একবার আমার দিকে চাহিল। আমিও চাহিলাম। অমনি আমি শিহরিয়া উঠিলাম, লণ্ঠনটা আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল, আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। "বিকুয়া, তুই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রায় পাঁচবৎসর পূর্ব্বেকার একটি ঘটনা বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় আমার মনে পড়িয়া গেল।

আমি তখন এটোয়ায়। রেলওয়ের কতকগুলি সাইডিং প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সকল কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন মরে সাহেব। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কি জানি কি ভাবিয়া আমাকে সেই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া মরে সাহেবকে অন্যত্র বদলি করিলেন। সাহেবের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট আলাপ ছিল, চার্জ্জ বুঝাইয়া মরে সাহেব আমাকে জানাইলেন যে সেস্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি মনের সাধ মিটাইয়া পরদিন শিকার করিবেন। আমি যদি তাঁহার সঙ্গী হই তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন।

কি করি, সাহেবের সঙ্গে শিকারে চলিলাম। ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে, যমুনার নিকট পৃথ্বীরাজের পুরাতন দুর্গ আছে। সেখানে অনেক পাখী পাওয়া যায়। উভয়ে কাঁটা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, দুর্গের উপর উঠিলাম। সাহেব একঝাঁক পাখী লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন। পাখী সবগুলিই উড়িয়া গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। শব্দ লক্ষ্য করিয়া উভয়েই সেখানে যাইয়া দেখিলাম যে এক বৃদ্ধ মাটীতে পড়িয়া আছে, তাহার উরুতে গুলি লাগিয়াছে, সেখান দিয়া অবিশ্রান্ত রক্ত ধারা নির্গত হইতেছে, একটী যুবক সেখানে বসিয়া মাথায় পাগড়ী দিয়া বৃদ্ধের ক্ষত স্থান বাঁধিতেছে।

আমি হতবুদ্ধি হইলাম। বৃদ্ধকে অবিলম্বে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য যুবককে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। কটমট করিয়া আমাদের দিকে একবার চাহিল, তারপর

নিজের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল যে কেন আমরা তাহার পিতাকে মারিয়াছি।

মরে সাহেব তাহার হস্তে একটি টাকা দিলেন, সে তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, আমি তাহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল।

শিকার করা আর সেদিন হইল না। ভোরের ট্রেণে মরে সাহেব এটোয়া হইতে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় ষ্টেশন প্লাটফরমে পাইচারি করিতেছি, এমন সময়ে সম্মুখে দেখি সেই যুবক। সে ব্যাঘ্র-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে, আমি ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না, এমনি একটা আতঙ্ক আমাকে বেষ্টন করিয়ছিল।

সে জানাইল যে তাহার পিতা প্রাণত্যাগ করিয়াছে; এবং কঠোর স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কেন আমি তাহাকে পিতৃহীন করিলাম।

আমি বুঝাইলাম যে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই, যে সাহেব এ কার্য্য করিয়াছেন, তিনি স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে বিশ্বাস করিল না, বলিল যে আমারও হাতে বন্দুক ছিল, সুতরাং আমিই তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছি।

আমার রাগ হইল, তাহাকে সেস্থান ত্যাগ করিতে বলিলাম, সে নড়িল না। অবশেষে তাহাকে দূর করিয়া দিবার জন্য একজন খালাসীকে বলিলাম। সে তখন চলিয়া গেল। যাইবার সময় সেইরূপ কঠোর দৃষ্টিতে আর একবার আমার দিকে চাহিয়া, ষ্টেশন কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া জানাইয়া গেল যে, যেমন করিয়া তাহার পিতাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইয়াছে, তেমনি নিষ্ঠুর ভাবে সে আমার সর্ব্বনাশ করিবেই করিবে।

ভয়ে ও আতঙ্কে প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল।

তারপর কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার সে চাহান কখনও ভুলি নাই। সেই যুবকই এই বিকুয়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার চীৎকার শুনিয়া বিকুয়া বলিল "বাবু আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন!" আমি বলিলাম "হাজার লোকের মাঝখানেও তোকে আমি চিনবো। তা তুই, এরকম ফকীরন্দীর সেজে ছিলি কেন?"

বিকুয়া বলিল "বাবু, আমায় মাপ করুন। যথার্থই আপনার সর্ব্বনাশ করবার জন্যেই আমি আপনার আশ্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু বাবু খোকাবাবুর মায়াতে পড়েই তা আর পারলাম না। আপনি আমার বাপ্ হুজুর!" বলিয়া সে আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

আমি বলিলাম, "আমার খোকাকে আজ খুন করছিলি কেন হারামজাদা!"

সে বলিল, "না বাবু, আমার মনে কখনও সেকথা ওঠেনি। খোকাবাবু পাহাড় দেখতে একলা যাচ্ছিল বলেই আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম। তারপর হুজুর, যখন পাহাড়ের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, তখন সে পাথর ঠেলে বেরুবার জন্যে আমার দেহে যা শক্তি ছিল তা করেছি, দেখুন বাবু আমার কাঁধ দিয়ে হাতদিয়ে এখনও রক্ত বেরচ্ছে। পাথরটা একটু সরিয়ে ফাঁকও করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে তাতে আমি বেরুতে পারবো না, তবে খোকাবাবুকে চেষ্টা করলে বের করে দিতে পারবো। তাই তাকে বুকে করে নিয়ে সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে বের করবার চেষ্টা করছিলাম, এমন সময় সেই পাথরের ভেতর থেকে মস্ত একটা সাপ বেরিয়ে এলো বাবু! তা একটা ছোট পাথর কুড়িয়ে সে সাপটাকে তখনই মেরে ফেলেছি। তারপর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।"

গৃহিণী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সেদিন তাহাকে খাওয়াইলেন। আমিও বলিলাম "বিকুয়া তুই আমার ছেলেকে আজ বাঁচিয়েছিস। কিন্তু এখনও আমি বলছি বিকুয়া, তোর বাপকে আমি মারি নি। আমি একটা গুলিও ছুড়িনি। সাহেবের গুলিই তার পায়ে লেগেছিল।"

বিকুয়া বলিল, "আর সে কথা বলবেন না হুজুর!"

ভোরে উঠিয়া আর তাহাকে দেখা গেল না। অনেক খোজা খুঁজি করিলাম, কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। কলিকাতায় আসিয়াও অনেক খুঁজিয়াছিলাম, এটোয়ার ষ্টেশনমাষ্টারকেও চিঠি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্যাবধি আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

সমাপ্ত